সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানব সভ্যতা ও প্রকৃতির বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা বসবাস থেকে শুরু করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চলেছি; কখনো সরাসরি আবার কখনো বা তার পরিবর্তিত রূপে। প্রতিদিনের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে চলেছি অবিরাম। আমরা আমাদের বেঁচে থাকার সকল উপাদানই পাই প্রকৃতি থেকে। কিন্তু প্রকৃতির উপাদানের এই অবিরাম ব্যবহার কী কোনো বদল ঘটাচ্ছে আমাদের চারপাশের পরিবেশের? তাই যদি হয়, তাহলে তা কী আমাদের জন্য কোন ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে? এই বিপদ এড়াবার জন্য আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বন্ধ করে দিতেও পারছি না, বন্ধ করে দিয়ে বাঁচার উপায় নেই। যে সম্পদ ব্যবহারে প্রকৃতির ক্ষতি নেই সেগুলো ব্যবহারের উপায় আমরা খুঁজে বের করতে পারি। এই উপায় খুঁজে বের করার কাজ সহজ নয় মোটেই। এর জন্য আমাদের প্রকৃতিকে আমরা আরও নিবিড়ভাবে দেখব, জানতে হবে প্রকৃতি ও মানুষের মিথস্ক্রিয়া।

আমরা আমাদের নিচের কাজগুলো করে প্রকৃতিকে ভালোভাবে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করব। জেনে নেবো প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের সাতকাহন।

- প্রথমে আমরা যে ছবিগুলো দেখছি, সেগুলো সম্পর্কে নিচের ছকে কিছু বাক্য লিখব। বাক্যগুলো হবে এটি কী? কোথায় বা কীভাবে আছে? কীভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? এবং এটি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে আমরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি?

ছবি	বাক্য
	এটি বন। জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বনভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়- চট্টগ্রামের বনাঞ্চল, সিলেটের বন, সুন্দরবন ও ঢাকা-টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলের বনভূমি।গাছপালা আমাদের অক্সিজেন সরবরাহ করে।তাই প্রয়োজনের তুলনায় গাছপালা বা বনভূমি হ্রাস পেলে পুরো জীবজগত হুমকির মুখে পড়বে।
	এটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।এটি সুন্দরবনে দেখা যায়।বাঘের এই প্রজাতি পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাঘ বিলুপ্ত হয়ে গেলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

	এটি শাপলা ফুল।শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল।যা দেশের ঐতিহ্য কে ধারন করে।এটি হারিয়ে গেলে সংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব পরবে।
	এটি নদী।পানযোগ্য পানির অধিকাংশই নদী থেকে সংগ্রহ করা হয়।কর্ণফুলী নদীকে কেন্দ্র করে দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।গ্রীষ্ম ও শীতকালে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় ক্রমেই দেশের নদীগুলোর নাব্য হারিয়ে যাচ্ছে। এতে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।
	এটি পাহাড়।পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।১.উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ ২.দক্ষিণ-পূর্বাংশ।বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা পাহাড়ী এলাকা ঘিরে গড়ে উঠেছে। তাই পাহাড় কেটে সমতলে পরিণত করার ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন হুমকির মুখে পড়ছে।
	এটি বঙ্গোপসাগর। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপসাগর। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে এর অবস্থান। বঙ্গোপসাগরের পরিবেশ অসংখ্য প্রজাতির চিংড়ি ও মাছের অনুকূল আবাসস্থল।উপকূলীয় চিংড়ি ঘেরের সম্প্রসারণ প্রভৃতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রতিবেশগত অবনতি সাধিত হচ্ছে।

- উপরের কাজটি করে প্রকৃতির সকল কিছুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে কতটা নিবিড় তার কিছুটা বুঝতে পারা গেল। এবার আমরা শিক্ষকের সহায়তায় আমাদের আশেপাশে উদ্ভিদ ও পাণীর সন্নিবেশ আছে এমন একটি জায়গা সরাসরি গিয়ে দেখে আসবো। এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করব।

পর্যবেক্ষণকৃত প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের কার্যাবলির প্রভাব

স্থানের ছবি ও নাম	মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে	সমস্যা চিহ্নিতকরণ	সংরক্ষণে করণীয়
বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকা	পাশের ছবির মতো বাংলাদেশে ছোট বড় মিলিয়ে ৭০০ নদী আছে। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নদীর প্রভাব অপরিসীম। সেচের পানি, শিল্পে ব্যবহৃত পানি, জলবিদ্যুৎ ও মৎস্য সম্পদের উৎস এসব নদী। তাছাড়া নদী আমাদের পরিবহন ও যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।নদীকে কেন্দ্র করে মানুষ খাদ্যোৎপাদন, মাছ শিকার, পণ্য পরিবহন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি গড়ে তোলে	•নদীর গতিপ্রবাহে বাধা। •শিল্প ও জলযানের বর্জ্য ফেলা। •পয়ঃনিষ্কাশন প্রবাহ যুক্ত করা। •নদী দখল। •পলি জমে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া	•পলি পড়ে ভরাট হয়ে •যাওয়া নদ-নদী খনন করা। •নদীর ওপর অপ্রয়োজনীয় বাঁধ, পুল, কালভার্ট নির্মাণ না করা। •পানি প্রবাহ ঠিক রাখা ও জলাধার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া। •নদীভাঙন রোধ করা।

- পর্যবেক্ষণ শেষে আমরা আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল আমাদের বন্ধুদের ও শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করব।

বিভিন্ন প্রকার বায়োম সম্পর্কে অনুসন্ধান ও মডেল তৈরি

- আমরা আমাদের পূর্ববর্তী কাজগুলোর মাধ্যমে আমাদের আশপাশের প্রতিবেশ দেখেছি। এসব প্রতিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কিছুটা জেনেছি। পৃথিবীজুড়েই রয়েছে এরকম অনেক ধরনের প্রতিবেশ। যেসব স্থানের জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীও আলাদা রকমের, বাংলায় এসব স্থানকে বলে জীবাঞ্চল, ইংরেজিতে বলে বায়োম (Biome)। এসব জীবাঞ্চলগুলোর জলবায়ু কেমন, কেমন ভাবে সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিন্যাস ঘটেছে এবং সেসব স্থানের ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়ে যায় বা যেভাবে আছে সেভাবে আর না থাকে, তাহলে আমাদের জীবনে তার কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয় তোমাদের জানতে হবে। এসব জানা হলে আমরা প্রকৃতি ধ্বংস না করে প্রকৃতি ব্যবহারের কথা ভাবতে পারব। এসব বিষয় অনুসন্ধান করে আমরা বের করব জীবাঞ্চলগুলোর সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া।
- এ কাজটি করার জন্য আমরা প্রথমে পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখব, পরে আমরা মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানগুলো গ্লোব বা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে খুঁজে বের করে আমাদের বইয়ে দেওয়া ছকে সেগুলো লিখব।

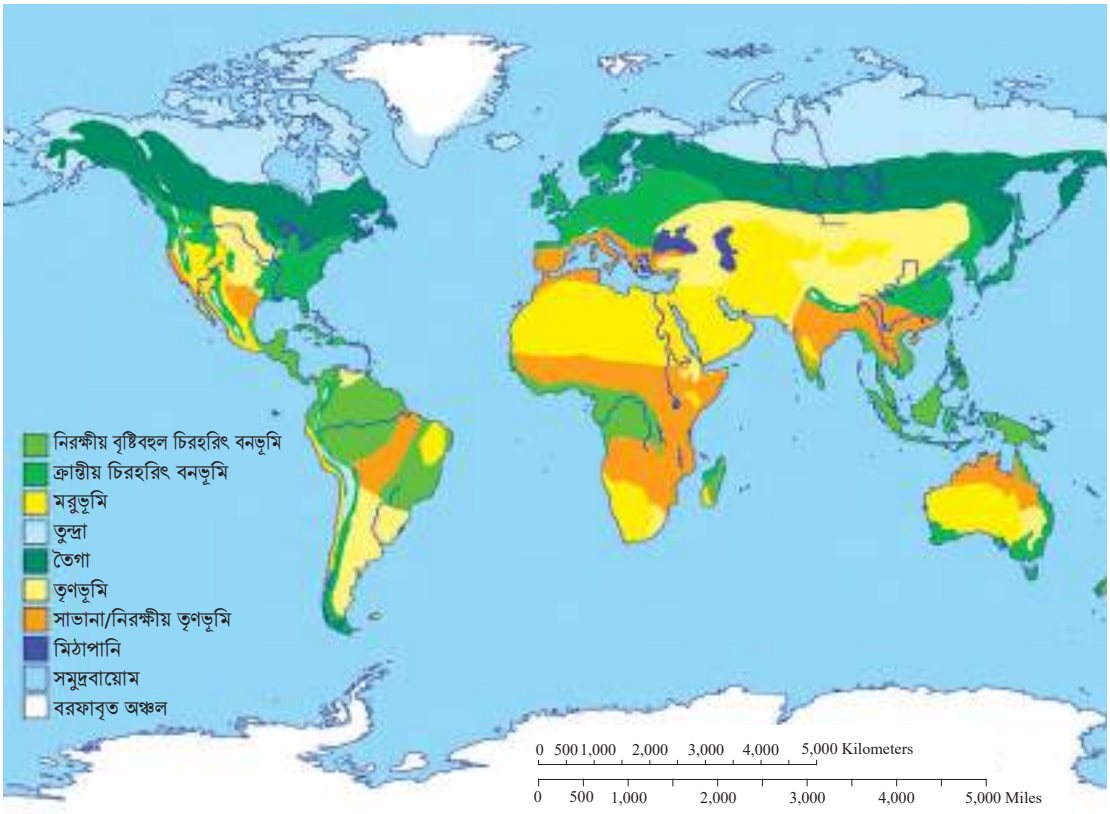

মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানের নাম	পৃথিবীর মানচিত্রে অবস্থান
১. তুন্দ্রা	কানাডার প্রায় অর্ধেক অংশ এর অন্তর্গত।
২. তৈগা	রাশিয়া,কানাডা,আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি
৩. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল	মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা,পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা।
৪. মরুভূমি	সাহারা মরুভূমি,অস্ট্রেলিয়া,পশ্চিম এশিয়া।
৫. তৃণভূমি	পূর্ব আফ্রিকা,উত্তর আমেরিকা,অস্ট্রেলিয়া।
৬. সমুদ্র বায়োম	প্রশান্ত,আটলান্টিক,ভারত,অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগর।
৭. মিঠাপানি	উত্তর আমেরিকা,কানাডা,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৮. নিরক্ষীয় তৃনভূমি	পূর্ব আফ্রিকা,উত্তর আমেরিকা,অস্ট্রেলিয়া।
৯. সাভানা	আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ভারতে।
১০. বৃষ্টিবহুল চিরহরিৎ বনভূমি	নিরক্ষীয় আফ্রিকায়, মায়ানমার হতে ইন্দোনেশিয়া,দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

- এবার আমরা এসব বায়োম সম্পর্কে আরেকটু ভালোভাবে জেনে নেব। যেকোনো বিষয় সম্পর্কে জানার গভীরে যেতে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। সেজন্য আমরা দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দল একটি করে বায়োম নিয়ে অনুসন্ধান করব। এই অনুসন্ধান কাজটি আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ মেনে করবো। অনুসন্ধানের জন্য আমরা প্রথমে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করব। প্রশ্নমালাটি আমরা নিচের মতো করে তৈরি করতে পারি, আবার এর সাহায্য নিয়ে অন্যরকম ভাবেও করতে পারি।

বায়োম নিয়ে অনুসন্ধান

১. বায়োমটি কোথায় কোথায় আছে?
২. সেখানে কোন ধরনের জলবায়ু বিদ্যমান?
৩. কী কী ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সন্নিবেশ দেখা যায়?
৪. উক্ত বায়োমটি পৃথিবীর জন্য কী কী সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে?
৫. উক্ত বায়োমটির জলবায়ু ও অন্যান্য সমাবেশের পরিবর্তন হলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?
৬. **উক্ত বায়োমে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধানগুলি কী কী হতে পারে?**
৭. **উক্ত বায়োমের অন্তর্গত প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারে আমাদের কী ভূমিকা পালন করতে হবে?**
৮. **উক্ত বায়োমটির সাথে মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া সংক্ষেপে লিখ।**

- এই অনুসন্ধান কাজের জন্য আমাদের যে যে তথ্য লাগবে, তা আমরা আমাদের বইয়ের শেষে যে অনুসন্ধানী পাঠ অংশ থেকে নিতে পারি অথবা ইন্টারনেটের সাহায্যও নিতে পারি।
- অনুসন্ধানের কাজ শেষ হলে আমরা আমাদের নিজ নিজ দলের অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বায়োমের মডেল আকারে উপস্থাপন করব এবং প্রতিটি প্রতিবেদন লেখার নিয়ম মেনে একটি প্রতিবেদন লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দেবো।

বায়োম মডেল

বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদের (বনভূমি) পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকী অনুসন্ধান

আমরা তো দেখলাম, আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশের ওপর কতটা নির্ভরশীল, আর এই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে বনভূমি। আমাদের বাঁচতে হলে যেমন প্রকৃতিকে প্রয়োজন, তেমনি প্রকৃতির টিকে থাকার জন্য দরকার বনভূমি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতেই বনভূমির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য আকারে কমে যাচ্ছে। এবারে আমরা জানবো, বনভূমি কোথায় কোথায় কমে যাচ্ছে কিংবা তার বর্তমান অবস্থা কী। এর জন্য প্রথমে আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর কোথায় কোথায় বনভূমি রয়েছে এবং সেসব কী নামে পরিচিত। আমরা পরবর্তী কয়েকটি কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন বনভূমি কোথায় অবস্থিত এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেসব বনভূমির কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে তা অনুসন্ধান করে বের করি।

- প্রথমে আমরা পৃথিবীর মানচিত্র বা একটি গ্লোবের সাহায্যে পৃথিবীর বিখ্যাত বনভূমিগুলো কোনো কোনো দেশে আছে এবং তারা কোন মহাদেশের অন্তর্গত তা খুঁজে বের করব;তারপরে নিচের ছকটি পূরণ করব।

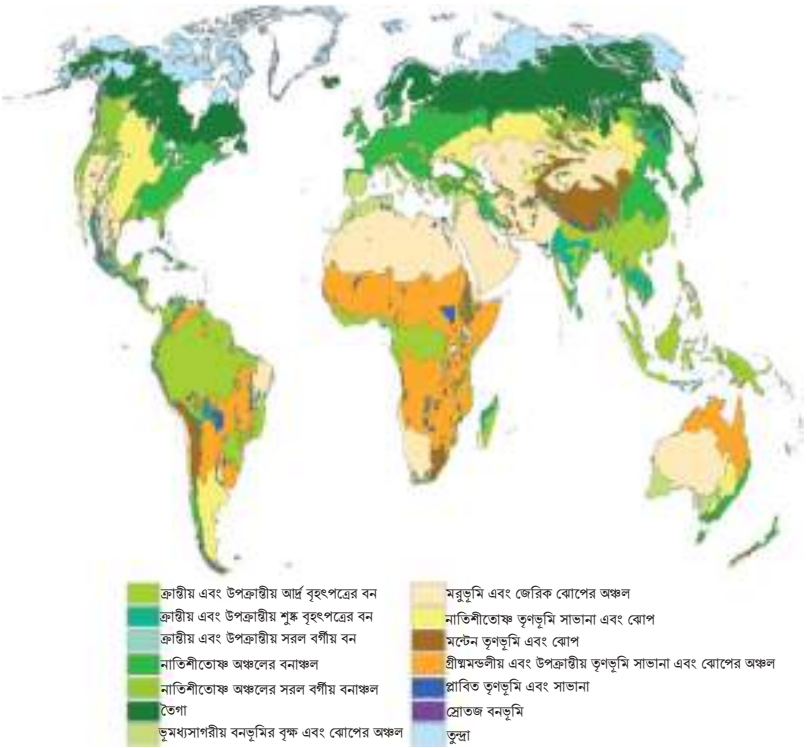

বনভূমির নাম	মহাদেশ ও দেশের নাম
ক্রান্তীয় বন	**মহাদেশ: এশিয়া, দেশ: ইন্দো মালয়োশিয়া**
বৃহৎপত্রের বন	**মহাদেশ: দক্ষিন আমেরিকা, দেশ: ব্রাজিল**
নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চল	**মহাদেশ: দক্ষিন আমেরিকা, দেশ: কোরিয়া**
তৈগা	**মহাদেশ: ইউরোপ, দেশ: ফিনল্যান্ড**
ঝোপের অঞ্চল	**মহাদেশ: ইউরোপ, দেশ: ইতালি**
সাভানা	**মহাদেশ: আফ্রিকা, দেশ: সুদান**
প্লাবিত তৃণভূমি	**মহাদেশ: দক্ষিন আমেরিকা, দেশ আর্জেন্টিনা**
স্রোতজ বনভূমি	**মহাদেশ: এশিয়া, দেশ: বাংলাদেশ**
তুন্দ্রা	**মহাদেশ: এশিয়া, দেশ: রাশিয়া**

- এই পৃথিবীর অনেকগুলো বনভূমির কথা আমরা জানলাম, দেখলাম সেগুলোর নামের বৈচিত্র্য। এখন আমরা জানব এই বনভূমিগুলো কী অবস্থায় আছে। এ জন্য আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে বনভূমিগুলোর ২০০০ সাল এবং ২০২০ সালের অবস্থার পরিবর্তনের তুলনা করব।

পৃথিবীর মানচিত্রে বন আচ্ছাদিত অঞ্চল ২০০০ ও ২০২০ সালের তুলনামূলক আলোচনা	
২০০০ সাল	**২০২০ সাল**
১.আমাজন বনের মোট পরিমান ছিল ৭৫ লক্ষ বর্গ কি.মি.	১.বনভূমির প্রায় ৮ শতাংশ কমে গেছে।
২.আমাজনে বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল।	২.মানব বসতি স্থাপন করা হচ্ছে।
৩.আমাজনে সংঘটিত দাবানলগুলো ছিল সহনীয়।	৩.দাবানল গুলো অসহনীয়।
৪.আমাজন ছিল অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত।	৪.জীববৈচত্র্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।
৫.সুন্দরবনে টাইগারের সংখ্যা ছিল ৪৫০ টি।	৫.বাঘের সংখ্যা কমে হয়েছে ১১৪ টি।
৬.সুন্দরবনে জলধারা ছিল প্রায় ৫৫০ হেক্টর।	৬.জলধারা কমে ৩২২ হেক্টরে নেমে এসেছে।
৭.পৃথিবীর বনাঞ্চল আয়তন প্রায় দশ শতাংশ কমে গিয়েছে।	৭.বেশি বনভূমি উজার হয়েছে।
৮.পৃথিবীর মোট বনভূমির পরিমান ছিল ৪.১ হেক্টর।	৮. ৪ বিলিয়নের নিচে চলে এসেছে।
৯.পৃথিবীর বন উজাড় হয়েছে প্রায় ৩২ কোটি হেক্টর।	৯.বন উজার হয়েছে ২৬০ কোটি।
১০.বনাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কম ছিল।	১০.মানুষের নির্ভরশীলতা বন ধ্বংসের অন্যতম কারন।

বাংলাদেশের বনভূমি:

- এবার আমরা চোখ রাখব আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বনাঞ্চলের দিকে । অনুসন্ধান করে বের করব বনজ সম্পদের বর্তমান অবস্থা; খুঁজে বের করব বাংলাদেশের প্রকৃতিকে বাঁচানোর উপায়। তাহলেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে বাঁচানোর কথা আমরা ভাবতে পারব। এভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ নিজ নিজ মাতৃভূমির দিকে ফিরে তাকালে সারা পৃথিবীর প্রকৃতি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পাবে।

অনুশীলনী

প্রথমে আমরা বাংলাদেশের মানচিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন আচ্ছাদিত এলাকার অবস্থান দেখবো এবং তারপর বাংলাদেশের একটি খালি মানচিত্রে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে বনভূমিগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করব।

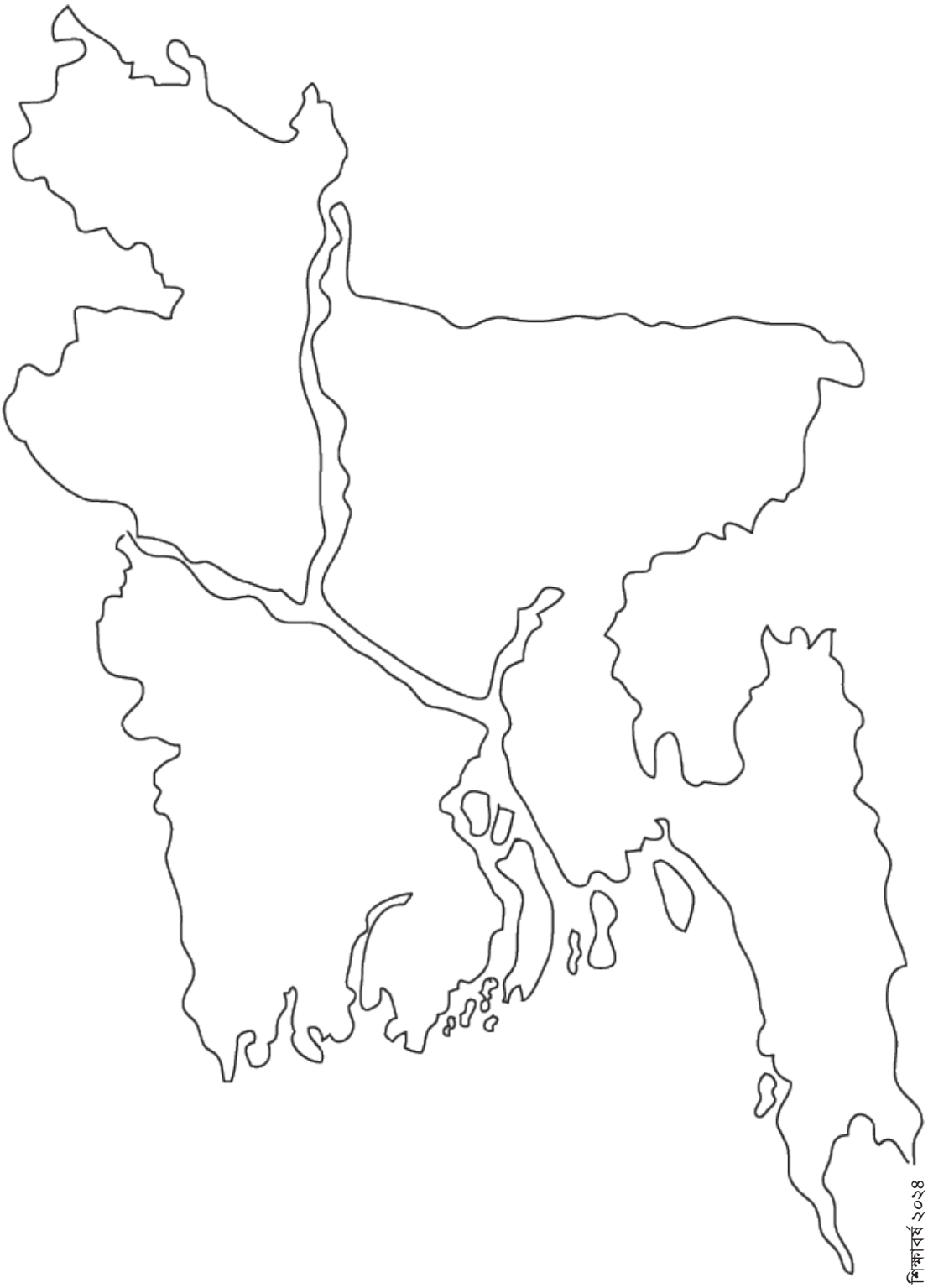

- এবারে আমরা যেসব বনভূমির নাম ও অবস্থান জানলাম, সময়ের সঙ্গে সেসবের পরিবর্তনের ধরন দেখব।

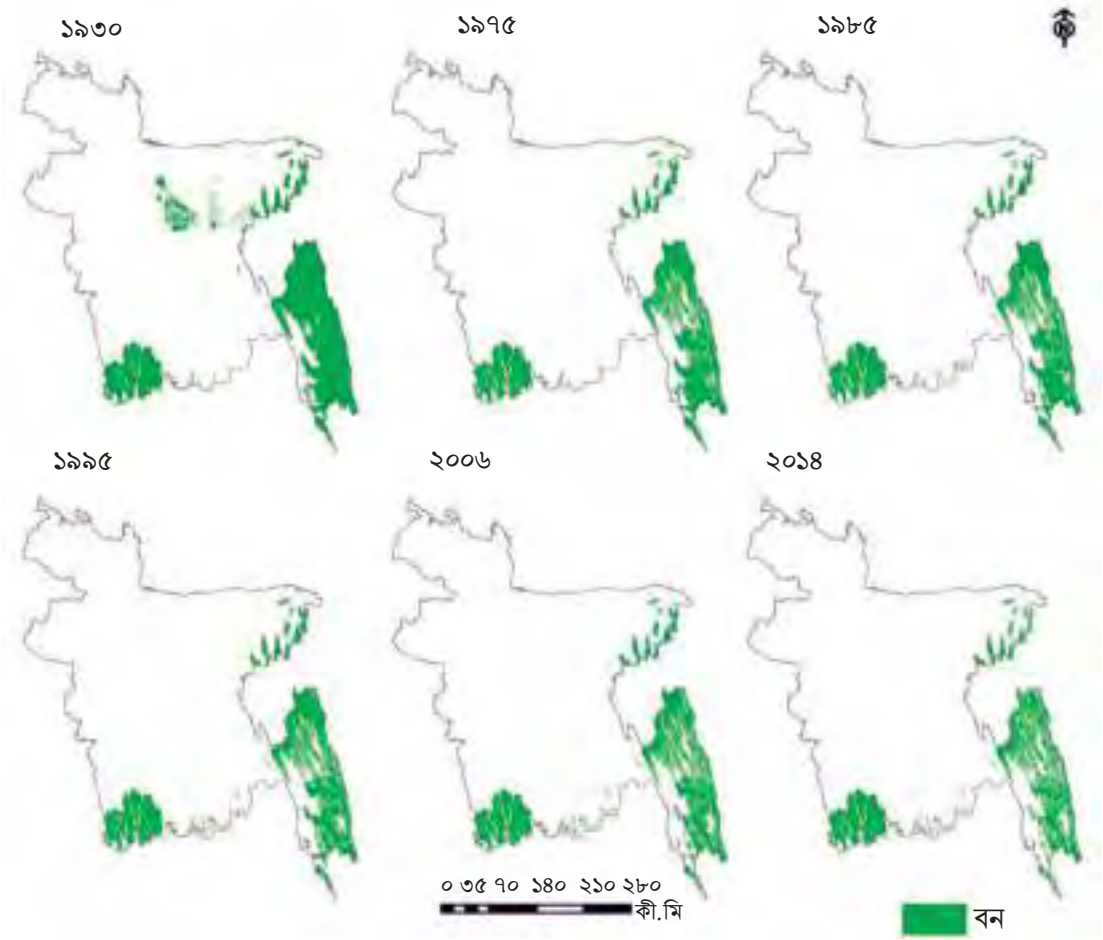

- উপরে বাংলাদেশের বনভূমির দিন দিন কমে যাওয়া দেখলাম। এর ফল যে ভালো নয়, তা তো তোমরা জানোই। কিন্তু এর ফলে ঠিক কোনো কোনো ধরনের বিপদে আমরা পড়তে পারি তা জানতে হলে বা বিপদের মাত্রা নির্ধারণ করতে হলে আমাদের আরও গভীরভাবে জানতে হবে। আর এর জন্য এবার আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করব।
- আমরা এই অনুসন্ধানের কাজটি দলীয়ভাবে করব। আর এর বিষয় হবে –

  ক. বাংলাদেশের বনভূমির কী কী পরিবর্তন হয়েছে?

  খ. পরিবর্তনের কারণগুলো কী কী?

  গ. পরিবর্তনের ফলাফল কী হতে পারে?

  ঘ. প্রকৃতির টেকসই সংরক্ষণে কী কী ভূমিকা নেওয়া যেতে পারেন?

- এই অনুসন্ধান কাজের তথ্য আমরা পাব অনুসন্ধানী পাঠ অংশে বা ইন্টারনেটের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।
- অনুসন্ধানের কাজ করার সময় আমরা নিচের ছকে প্রদত্ত সূচকগুলো মনে রেখে করব ।
- অনুসন্ধান পরবর্তী ফলাফল পোস্টারের মাধ্যমে অথবা নাটক আকারে উপস্থাপন করব।

বনভূমির নাম ও অবস্থান	বর্তমানে কী কী পরিবর্তন হয়েছে	পরিবর্তনের কারণসমূহ	এসব পরিবর্তন আমাদের জীবনে কোন কোন প্রভাব ফেলতে পারে/ ফলাফল	টেকসই উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আমাদের করণীয়

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী কাজের মাধ্যমে এটা বুঝতে পারলাম যে মানুষ দিন দিন প্রকৃতির একটা ছোটো অংশ হয়েও অবিরত প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এর ফল যে কতটা মারাত্মক তা ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের মনে করিয়ে দেয়। এখন আমরা পরবর্তী কাজগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে পারি।

- প্রথমে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে ভূমিরূপের অভিধান তৈরি করেছিলাম, সেই কথা মনে করার চেষ্টা করি। কেউ ভুলে গিয়ে থাকলে পুরানো বই জোগাড় করে দেখে নিতে পারবে। এখন আমরা আমরা প্রতিটিে যষ্ঠ শ্রেণির মতো একটি অভিধান তৈরি করব। তবে সেটি হবে আমাদের দুর্যোগ অভিধান। কাজটি করার জন্য আমরা একটি ডায়েরি বানাব, পরে আমরা যে যে দুর্যোগ সম্পর্কে জেনেছি ,তার প্রতিটির একটি করে ছবি এবং সেটি সম্পর্কে কয়েকটি লাইন লিখব।

দুর্যোগ অভিধান

- আমাদের অভিধান বানানো হলে আমরা আমাদের বন্ধুদের সঙ্গেও তা বিনিময় করব।
- এরপর আমরা দলে ভাগ হয়ে প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে আমাদের এলাকায় কোন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, এ সকল দুর্যোগের কারণে আমাদের কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এটি প্রতিরোধ করতে টেকসই ব্যবস্থাপনা কী কী হতে পারে তা অনুসন্ধান করে বের করব। এই অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা আমাদের পরিবার বা এলাকায় মানুষদের কাছ থেকে নিতে পারব।
- আমরা আমাদের ফলাফলগুলো নিয়ে একটি পত্রিকা তৈরি করব। আমাদের পত্রিকার শিরোনাম হবে আমাদের সংবাদপত্র: দুর্যোগ সংখ্যা।

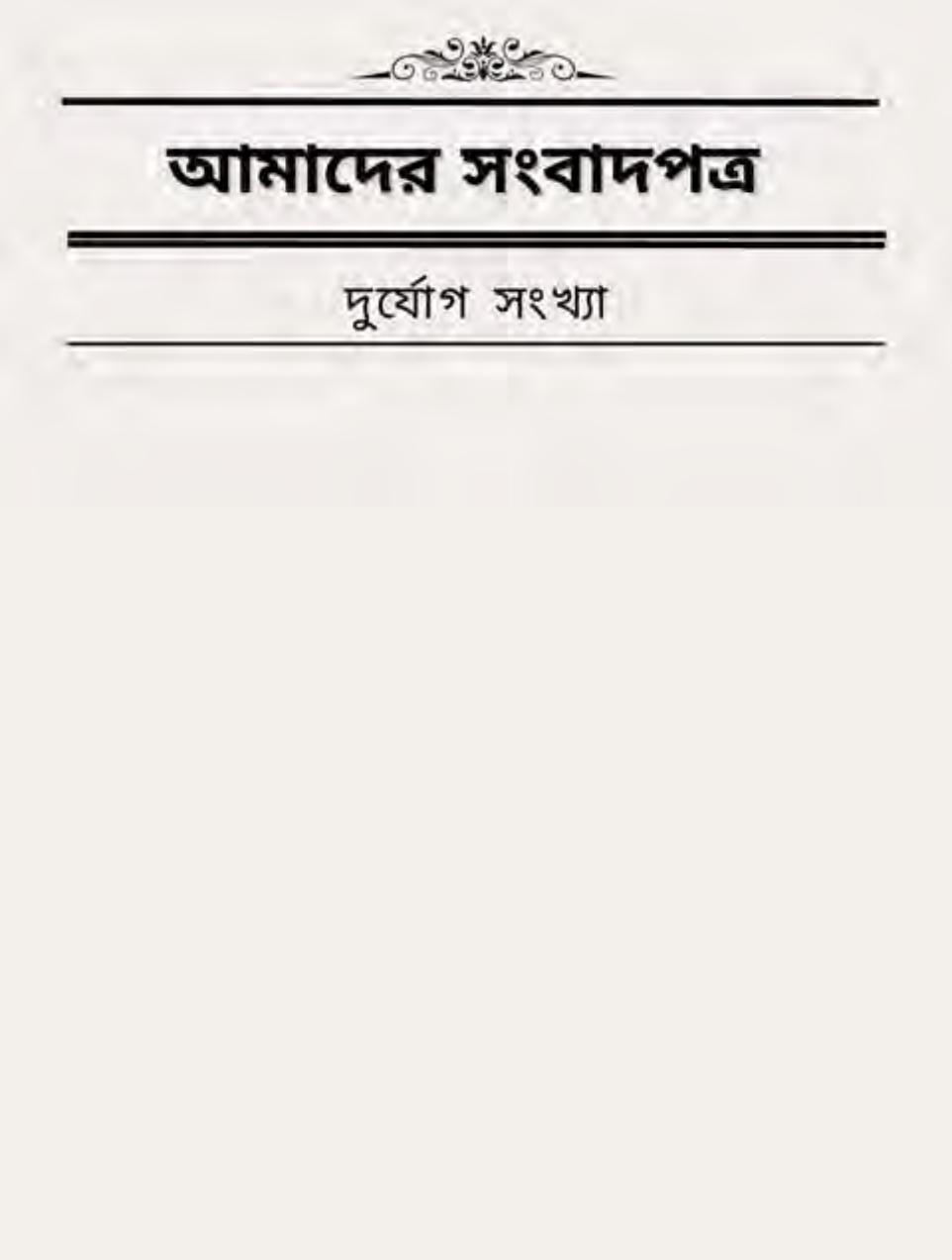
আমাদের সংবাদপত্র

দুর্যোগ সংখ্যা

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন

আমরা জানি আমরা বাঁচার জন্য প্রকৃতির ওপর কতটা নির্ভরশীল। অনেকগুলো কাজের মাধ্যমে আরও জানলাম প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক কতটা নিবিড়। কিন্তু আমরা কেবল প্রকৃতি থেকে নিচ্ছি, কিন্তু কিছুই ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি না। আমরা যদি প্রকৃতিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার না করি, যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে একদিন প্রকৃতির আমাদেরকে দেওয়ার ক্ষমতা নিঃশেষ হবে যাবে। তাহলে আমরা প্রকৃতি ঠিক রেখে আমাদের

প্রয়োজন মেটানোর পরিকল্পনা করব। আর এর নাম হলো টেকসই উন্নয়ন। এই পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে পারব। তাহলে আমাদেরও উচিত আমাদের নিজস্ব পরিসরে টেকসই উন্নয়নের চর্চা করা, তাই না? এ কাজগুলো আমরা আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাব ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করব।কিন্তু আমরা এখনো ছোটো, তাই আমরা আমাদের এসব কাজে এলাকার মানুষের সহযোগিতা নেবো।

চলো, তাহলে আমরা কী কী কাজ করতে পারি, তার একটি তালিকা দলে বসে চূড়ান্ত করে ফেলি।
১.
২.
৩.
৪.
৫.

এলাকায় সম্পদের টেকসই ব্যবহারমূলক কাজ:

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পচনশীল ও অপচনশীল এই দুই ধরনের বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

২. এলাকায় পুকুর, খাল বা অন্যান্য পানির উৎস যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধপত্র প্রেরণ এবং বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. এলাকায় ও নিজের আবাসনে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে টেকসই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ।

৪. নালা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এলাকাবাসীকে সচেতন করা।

৫. সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সবশেষে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের সামনে অপেক্ষা করছে অনেক বড়ো চ্যালেঞ্জ। আর এই সকল চ্যালেঞ্জ তখনই মোকাবিলা করতে পারব যখন আমরা টেকসইভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। আর এই কাজে আমরা সফল হব তোমাদের মতো ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মাধ্যমে, তোমরাই গড়ে তুলবে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাত-সহিষ্ণু নিরাপদ সমৃদ্ধ বদ্বীপ।

সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন: অনুসন্ধানী অংশ

তুন্দ্রা বায়োম

আমাদের আবাসভূমি এ পৃথিবী এমন এক অনন্য গ্রহ, যেখানে বিভিন্ন পরিবেশে নানা ধরনের জীবের সন্নিবেশ ঘটেছে। বিশাল সমুদ্র থেকে সুউচ্চ পর্বত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী তাঁদের পরিবেশের সঙ্গে একটি বিস্ময়কর সমন্বয়ের মাধ্যমে একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে। পৃথিবীর কোনো একটি অঞ্চলে বিশেষ ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এলাকাকে বায়োম বলা হয়ে থাকে। বায়োমকে বাংলায় জীবভূমি বা জীবাঞ্চলও বলা যেতে পারে। প্রাণী বা উদ্ভিদের আবাসস্থলের (Habitat) থেকে বড়ো পরিসরে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ইত্যাদিসহ বিবেচনায় নিয়ে বায়োমকে চিন্তা করা হয়। এই বৈচিত্র্যময় বায়োমগুলো বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) বজায় রাখে এবং বিভিন্ন প্রজাতিকে ধারণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অংশে আমরা বায়োমের আকর্ষণীয় জগৎকে জানব এবং এর অস্তিত্বের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করব।

১. তুন্দ্রা (Tundra): তুন্দ্রা বায়োম হলো এমন অঞ্চল, যেখানে তাপমাত্রা খুব কম, শীতকাল দীর্ঘ এবং জীবের উৎপাদনকাল সংক্ষিপ্ত। এখানকার মাটি ঠান্ডা এবং অপেক্ষাকৃত কম উর্বর, ছোটো আকারের খুব অল্প গাছপালা জন্মায়। বৃষ্টিপাত খুবই অল্প, কিন্তু প্রায়ই প্রবল বায়ুপ্রবাহ হতে দেখা যায়। মানব বসতিহীন তুন্দ্রা অঞ্চলকে এর বৈশিষ্ট্যের কারণে মেরু মরুভূমিও বলা হয়ে থাকে। বরফ আবৃত আর্কটিক অঞ্চলের নিচেই তুন্দ্রা বায়োম অবস্থিত যা উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। আলাস্কা এবং কানাডার প্রায় অর্ধেক অংশ তুন্দ্রা বায়োমের অন্তর্গত। আর্কটিক তুন্দ্রা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে হিমায়িত মাটির স্তর দেখা যায়

যাকে Permafrost বলা হয়। এখানে বসবাসকারী প্রাণীদের ত্বকের নিচে পুরু চর্বির স্তর থাকে এবং গায়ের বর্ণ সাধারণত তুষারের মতোই সাদা হয়, যা তাঁদেরকে অভিযোজনে সহায়তা করে। মেরুভাল্লুক, বল্গা হরিণ, আর্কটিক শিয়াল, সামুদ্রিক সিংহ, বিভিন্ন ধরনের সিল ইত্যাদি বলিষ্ঠ প্রাণী প্রজাতি এই কঠিন পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। পরিযায়ী পাখি যাঁরা শীতকালে দক্ষিণে চলে যায় তাঁদেরকেও এ তুন্দ্রা অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে যদিও তুন্দ্রা অঞ্চলকে বৃক্ষহীন মনে হয় তবে এখানে স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় ফুল ফোটে এবং দ্রুত বৃদ্ধি হয় এমন লোমশ ডালপালার ক্ষুদ্র আকারের উদ্ভিদ, যেমন:তুলা, লাইকেন, এমাপোলা, বেরি ইত্যাদি দেখা যায়। এই বায়োম বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমাবেশ ঘটিয়ে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করেছে। তবে বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলেও পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন তুন্দ্রা অঞ্চলের বরফ আগামী কিছুদিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গলে যেতে পারে। তাতে এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবিস্তার ও স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে। যথাযথ পরিবেশ না পাওয়ার কারণে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার গলে যাওয়া বরফ থেকে যে পানি তৈরি হবে তা সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। এতে আমাদের দেশের মতো সমুদ্র উপকূলীয় সমতল ভূমির দেশ সমূহে নানারকম সমস্যা, যেমন: নিম্নভূমি তলিয়ে যাওয়া, লবণাক্ত এলাকার বিস্তৃতি এবং কৃষিকাজ ব্যাহত হয়ে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের দেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে উপকূলীয় অঞ্চলের কিছু অংশ তলিয়ে গেলে সেখানকার ব্যাপকসংখ্যক লোকজনের জলবায়ু-উদ্বাস্তু হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

২. তৈগা বায়োম (Taiga Biome): তৈগা (Taiga) একটি রাশিয়ান শব্দ, যার অর্থ হল সরলবর্গীয় অরণ্য বা পাইন বন। উত্তর গোলার্ধে তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়া, বিশেষভাবে কানাডা এবং রাশিয়ার সুবিস্তৃত সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলই হলো তৈগা। তুন্দ্রা বায়োমের যেখানে শেষ তার দক্ষিণে তৈগা বায়োম শুরু যা কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে ৫০ থেকে ৭০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে। এটি রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (মূলত আলাস্কা অঞ্চল), সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, এস্টোনিয়া, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (মূলত স্কটিশ উচ্চভূমি অঞ্চল), আইসল্যান্ড, কাজাখস্তান (উত্তরাংশ), মঙ্গোলিয়া (উত্তরাংশ), জাপান (হোক্কাইডো দ্বীপ) প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত রয়েছে। ইংরেজিতে Boreal Forest বা Snow Forest নামে পরিচিত। এই বায়োমের প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতিগুল হলো পাইন, বার্চ, লার্চ, এল্ডার, উইলো, পপলার, ওক, ম্যাপল, স্প্রুস, ফার প্রভৃতি। তৈগা বায়োমের প্রধান প্রাণী প্রজাতিগুল হলো বাদামী ভালুক, কালো ভালুক, সাইবেরিয়ান বাঘ, নেকড়ে, বগ্লা হরিণ, লাল শিয়াল, ভোঁদড়, নেউল, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি প্রভৃতি। এ বায়োমের সরলবর্গীয় অরণ্য বা পাইন বনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এধরনের গাছের পাতাগুলো ফলা আকৃতির এবং উপর দিকে খাড়া থাকে। এগুলোর ডালপালা ছড়ায় না বিশেষ, সোজা ওঠে যায় বলে এগুলো সরল বর্গের গাছ বা সরলবর্গীয় বৃক্ষ। এর ফলে শীতকালে এর ওপরে পড়া তুষার বা বরফ সহজেই মাটিতে ঝরে যায়। এ বায়োমে সারাবছরই তুষারপাত বা বৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত বছরের শীতকালের ছয় মাস এখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে তুষারপাত হয় তার গড় উচ্চতা ৫০ থেকে ১০০ সে.মি. হয়ে থাকে। দুই থেকে তিন মাস স্থায়ী গ্রীষ্মকালে এই বায়োমে গড়ে ৭৫ সে.মি. এর মতো বৃষ্টিপাত হয়। তুন্দ্রার মতো তৈগা বায়োমও জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের আগ্রাসী মনোভাবের শিকার হচ্ছে।

৩. নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল (Tropical Rainforest): এই বায়োম হলো সতেজ এবং প্রাণবন্ত বাস্তুতন্ত্র যা প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং ঘন গাছপালা সমৃদ্ধ। এক সময়ে পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগের প্রায় ১৪ শতাংশ জুড়ে এ বনভূমি থাকলেও তা এখন কমে প্রায় ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিষুবরেখার উত্তর বা দক্ষিণে ১০ ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া ইন্দো মালয়েশিয়া অঞ্চল, নিউগিনির দ্বীপসমূহ এবং অস্ট্রেলিয়ায় এই বায়োম ছড়িয়ে আছে। নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল আমাজন বনাঞ্চল যা অক্সিজেন উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ কারণে এটি 'পৃথিবীর ফুসফুস' হিসাবে পরিচিত। এটি বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের কার্বন শোষণ ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখছে। এছাড়াও এটি অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাস স্থল, যার অনেকগুলো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি বলে মনে করা হয়। নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চলের উদ্ভিদগুলো দ্রুত বৃদ্ধিপায় এবং গাছপালা খুব ঘন থাকায় সেগুলোর মধ্যে সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য একধরনের প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ ধরনের বনভূমির কিছু এলাকায় ঘন বৃক্ষরাজির কারণে সূর্যালোক মাটির কাছে পৌঁছায় না। এ বনভূমির মাটি বৃষ্টির কারণে বেশিরভাগ সময় আর্দ্র এবং স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। এখানকার গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং দিন-রাতের তাপমাত্রার ব্যবধান খুবই কম। এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০ সে.মি. এর বেশি। তবে নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে। এখানকার গাছের পাতাগুলো বেশ বড়ো এবং প্রশস্ত হয় এবং সারাবছর ধরে সবুজ থাকে। একারণেই এ বনভূমিকে চিরসবুজ বন বলা হয়। এই বায়োমে প্রধানত তিন ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়। যথা: বৃক্ষ, লতানো বা আরওহী উদ্ভিদ এবং পরজীবী বা পরগাছাজাতীয় উদ্ভিদ।

এ ধরনের বনে বৃক্ষপ্রজাতির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধান বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে রোজউড, রাবার, আবলুস, মেহগনি, চাপালিস, গর্জন ইত্যাদি। লতানো বা আরওহী উদ্ভিদের মধ্যে আছে ফার্ন, লিয়ানাস। পরজীবী ও আরওহী উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে অর্কীড, মস, লিচেন, শৈবাল ইত্যাদি। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার কারণে এই বায়োমে উদ্ভিদের দ্রুত বৃদ্ধি হয় বলে প্রাণীদের খাদ্যের জন্য অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এ বনের ভূমিতে অবস্থানকারী প্রাণীদের মধ্যে আছে হরিণ, হনুমান, কটিমুন্ডিসের মতো প্রাণী। শিম্পাঞ্জী, বাইসন, হাতি, চিতাবাঘ, গরিলার মতো প্রাণীরা এ বনের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে। এ বনে রাতের বেলায় সক্রিয় প্রাণীর মধ্যে আছে অপসাম, আর্মাডিলো, জাগুয়ার, পেঁচা ইত্যাদি। এ বনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈচিত্র্যপূর্ণ পাখির সমাবেশ দেখা যায়। পাখির মধ্যে বাজপাখি, সুইফ্ট, কুরাসোস্, টিনামুস, হামিং, বাদুড়, পতঙ্গভুক ময়ূর, বিভিন্ন প্রজাতির মোরগ, দীর্ঘ ঠোঁটের টোকান, লম্বা লেজওয়ালা টিয়া, বারবেট, কটিঙ্গা, বিলবার্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বায়োমের প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন সর্বাধিক যা পৃথিবীর সমগ্র উদ্ভিদের প্রাথমিক উৎপাদনের (সূর্যালোক ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন) প্রায় ৪০ শতাংশ। তবে বিশ্ব জুড়েই মানুষের নির্বিচার বৃক্ষ নিধনের শিকার এ বনভূমিও। অনেক দেশে এ বনভূমি ধ্বংস করে কৃষিজমিতে রুপান্তর করা হয়েছে। যার ফলে বনভূমির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, বন্যপ্রাণী, পাখি তাঁদের বাসভূমি হারিয়েছে। এতে আমাদের জন্য বেশ কিছু কৃষিজমি বাড়লেও পরিবেশগত নানা ঝুঁকীর সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ি এলাকার বনভূমিতে বৃক্ষ নিধনের ফলে সেখানে ভূমিক্ষয় ও ভূমিধসের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বনভূমি ধ্বংসের কারণে জীববৈচিত্র্যও ঝুঁকীর সম্মুখীন হচ্ছে।

তবে অনেক রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বনভূমির বিনাশ মোকাবিলায় কাজ করছে।

৪. মরুভূমি (Desert): চিরহরিৎ বনাঞ্চলের সতেজ ও প্রাণবন্ত পরিবেশের বিপরীতে মরুভূমি হলো শুষ্ক বায়োম যা সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত এবং রাত-দিনের তাপমাত্রার অনেক বেশি তারতম্যের জন্য পরিচিত। এ ধরনের বায়োমে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০-পঁচিশে সে.মি. থেকে বেশি নয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে বায়ু আরওহণ প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প হারিয়ে মরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় এখানকার বাতাস অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। আর জলীয়বাষ্প কম থাকায় সূর্যরশ্মি সরাসরি ভূমিতে পড়ে দিনের বেলায় অতিদ্রুত তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আবার

বাতাসে আর্দ্রতা কম এবং আকাশে মেঘের উপস্থিতি না থাকায় রাতের বেলায় ভূপৃষ্ঠ দ্রুত তাপ হারিয়ে শীতল হয়ে যায়। মরুভূমিগুলো বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি নিয়ে গঠিত এক অনন্য ভূমিরূপ ধারন করে। এক সময়ে এসব মরুভূমিতে বড়ো বড়ো পাথর ছিল যা দিনের তাপ আর রাতের শীতল আবহাওয়ার কারণে যথাক্রমে প্রসারণ ও সংকোচনের মাধ্যমে ভেঙে ক্রমে বালির সৃষ্টি হয়। এখানে স্থায়ী বা সাময়িক কোনো জলাশয় বা জলধারা দেখা যায়না।

আপাতদৃষ্টিতে মরু বায়োমের প্রকৃতি চরম ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এখানে অনন্যভাবে অভিযোজিত গাছপালা এবং প্রাণী রয়েছে। তবে মরু বায়োমে উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈচিত্র্য অন্য বায়োমের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। মরুতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলো মূলত জেরোফাইটিক শ্রেণির যেগুলো শুষ্ক আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে। শক্ত ঘাস, কাঁটাযুক্ত ও লম্বা শিকড়যুক্ত ঝোপঝাড়, যেমন ক্যাকটাস, খেজুর ইত্যাদি মরুভূমির পরিচিত উদ্ভিদ। স্বল্পস্থায়ী আর্দ্র ঋতুতে কিছু ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের ফুল ফুটতে দেখা যায়। প্রাণীদের আকার তুলনামূলকভাবে ছোটো এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো নিশাচর। মরুভূমির কীটপতঙ্গের মধ্যে রয়েছে বিচ্ছু, মাকড়সা এবং অন্যান্য পোকামাকড়। টিকটিকী, গিলা দানব, রেটেল স্নেক ইত্যাদি বেশ কিছু সরীসৃপ এ পরিবেশে অভিযোজিত হয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উট, ক্যাঙ্গারু, সাদা লেজের হরিণ, পাহাড়ি ভেড়া, খরগোশ, ইঁদুর, শিয়াল, ব্যাজার অন্যতম। পাখির মধ্যে ক্যাকটাস-কাঠঠোকরা, দাঁড়কাক, গর্ত করা প্যাঁচা, টার্কী, শকুন, সুইফ্ট, গিলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মরুভূমি সাহারা যা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। এটা লক্ষনীয় যে, মরুভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের অনন্য নিদর্শন। এদের উপস্থিতি প্রকৃতির ভারসাম্যের জন্য অত্যাবশ্যক। মানুষের নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যাতে এসব জীবের বংশবৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত না হয়, সেজন্য মানুষকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

পৃথিবীর স্থল ও সমুদ্র ভাগে বিদ্যমান বায়োমসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ প্রাণীদের বিস্তরণ

৫. তৃণভূমি (Grasslands): তৃণভূমি বায়োম বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ঘাস বা তৃণ এবং অল্প কিছু বৃক্ষ দ্বারা আবৃত। গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ উভয় অঞ্চলেই তৃণভূমি রয়েছে। এগুলো অনেক বৈচিত্র্যময় বাস্তুসংস্থানকে ধারণ করে। তৃণভূমির বায়োমকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (ক) ক্রান্তীয় তৃণভূমি বা সাভানা (Tropical Grassland or Savanna) এবং (খ) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি (Temperate Grassland)।

(ক) সাভানা তৃণভূমি উভয় গোলার্ধের ১০ থেকে ২০ ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সারা বছর তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫-৭৫ সে.মি.। বৃষ্টিপাতের ৮০-৯০ শতাংশ গ্রীষ্মকালেই সংঘটিত হয়। বিস্তৃত পরিসরে সাভানা তৃণভূমির মধ্যে ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও ক্রান্তীয় ঝোপঝাড় অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব আফ্রিকা ও সাহারার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার দ্বীপ, মধ্য ও উত্তর আমেরিকায় সাভানা তৃণভূমি রয়েছে। সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে তিনটি ঋতু পরিলক্ষিত হয়, যথা: শুষ্ক শীতকাল, শুষ্ক গ্রীষ্মকাল এবং আর্দ্র গ্রীষ্মকাল। এখানে আর্দ্র গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন আকৃতির উজ্জ্বল সবুজ বা রুপালি রঙের তৃণ জন্মায় যা শুষ্ক শীত বা শুষ্ক গ্রীষ্মকালে বাদামি ধূসর রং ধারন করে এবং নুয়ে পড়ে। এই তৃণভূমিতে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে অল্প কিছু বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে বৃক্ষগুলোর পাতা ঝরে পড়ে বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। সাভানা তৃণভূমির ভূমিস্তরটিতে প্রধানত তৃণ ও বীরুৎ জাতীয় গাছ দেখা যায় যাদের উচ্চতা ৮০ সে.মি. থেকে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে আফ্রিকার তৃণভূমিতে ৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত তৃণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান তৃণপ্রজাতির মধ্যে রয়েছে পাস্পালাম, প্যানিকাম, স্কীমিসিয়া ইত্যাদি। এছাড়া গুল্ম ও কাঁটা জাতীয় কিছু উদ্ভিদ, পাইন, ইউক্যালিপ্টাসও দেখা যায়। সাভানা বায়োমের প্রাণীদের ব্যাপারে সকল শ্রেণির মানুষের বিশেষ কৌতূহল রয়েছে। আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমিতে সবচেয়ে বেশি তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়। এসবের মধ্যে আছে মহিষ, জেব্রা, জিরাফ, সিংহ, চিতা, হাতি, অ্যান্টিলোপ, জলহস্তী, গ্যাজেল ইত্যাদি। অস্ট্রেলিয়ার সাভানায় ক্যাঙ্গারু বাস করে। সাভানা তৃণভূমি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির অভয়ারণ্য। এসব পাখির মধ্যে টুকান, তোতাপাখি, ফিঞ্চ, ঘুঘু, মাছরাঙা, টিয়া, উটপাখি, এমু অন্যতম। অমেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে মাছি, পঙ্গপাল, উই, পিপীলিকা, বিছা, আরশোলা, ফড়িং ইত্যাদি।

(খ) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে সাভানা তৃণভূমির মতো বড়ো গাছ দেখা যায়না। এ তৃণভূমি মূলত মহাদেশীয় অঞ্চলের সেইসব এলাকাতে দেখা যায় যেখানে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কম বৃষ্টি হয়। পৃথিবী জুড়েই এ তৃণভূমি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ইউরেশিয়ান স্তেপ, দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস, উত্তর আমিরিকার প্রেইরি, নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টাবেরি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য তৃণভূমি বায়োম। এই বায়োমে গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২০-২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত পঁচিশে০ থেকে ৬৫০ সে.মি.। ইউরেশিয়ান স্তেপে টার্ফ, ট্রিফোলিয়াম, স্টিপা এবং জেরোফাইটের মতো কাঁটা জাতীয় ঘাস জন্মায়। প্রাণীদের মধ্যে আছে সাইগা অ্যান্টিলোপ, মঙ্গোলিয়ান গ্যাজেলস, বুনো ঘোড়া, ইগল, বাজপাখি, রোডেন্ট। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি তৃণভূমিতে ব্লুয়েস্টেম, সুইচ, নিডল, জুন, বাফেলো প্রজাতির ঘাস দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীর মধ্যে আছে বাইসন, রোডেন্ট, নেকড়ে, শিয়াল, ইগল, বাজপাখি। দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস তৃণভূমিতে ব্রীজা, পাসপালুম, লুনিয়াম প্রভৃতি ঘাস দেখা যায়। এখানকার পম্পা হরিণ, ভিসকা রোডেন্ট, বক, হাঁস প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার তৃণভূমিতে অ্যান্টিলোপ, হায়েনা, শিয়াল, লেপার্ড, জেব্রা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর বিচরণ দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমিতে ক্যাঙ্গারু, ওয়াল্লারুস, মেষ, এমু রয়েছে।

তৃণভূমি বায়োম কৃষিকাজ এবং গবাদিপশুর চারণভূমি হিসাবে অপরিহার্য। আবার এসব বায়োমে জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য সমাবেশ ঘটেছে। তবে মানুষের অবিবেচিত কর্মকান্ডের কারণে এসব বায়োমের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভীষণভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। তৃণাঞ্চল পুড়িয়ে মানুষ অনেক স্থান কৃষিজমিতে রূপান্তর করেছে। বহু বছর ধরে এভাবে তৃণভূমি পুড়িয়ে কৃষি বা অন্যান্য কাজে ব্যবহারের ফলে তৃণভূমি অনেক সংকুচিত হয়েছে এবং সেসব স্থানের উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ঝুঁকীতে পড়েছে।

৬. সামুদ্রিক বায়োম (Marine Biomes): তোমরা তো জানো, পৃথিবী গ্রহটিতে স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ অনেক বেশি। বিশাল মহাসাগর এবং সাগর গুলো নিয়ে গঠিত সামুদ্রিক বায়োম পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭০ ভাগ দখল করে আছে। এটি একটি জটিল এবং বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র, যা বিভিন্ন ধরনের রহস্যময় সামুদ্রিক জীব, যেমন: বিচিত্রসব মাছ, তিমি, প্রবাল প্রাচীর এবং অগণিত অন্যান্য জীবসমূহকে ধারণ করছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় সামুদ্রিক বায়োমের জীবদের লবণাক্ত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হতে হয়। এই বায়োম আঞ্চলিক জলবায়ুর ধরন দিয়ে তেমন একটা প্রভাবিত নয় বরং বিভিন্ন এলাকার জলবায়ুর ধরনকে মহাসাগরগুলো নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে। পৃথিবীর মহাসাগগুলোর বাইরেও অন্যান্য সাগর ও উপসাগরও এ বায়োমের অন্তর্ভুক্ত।

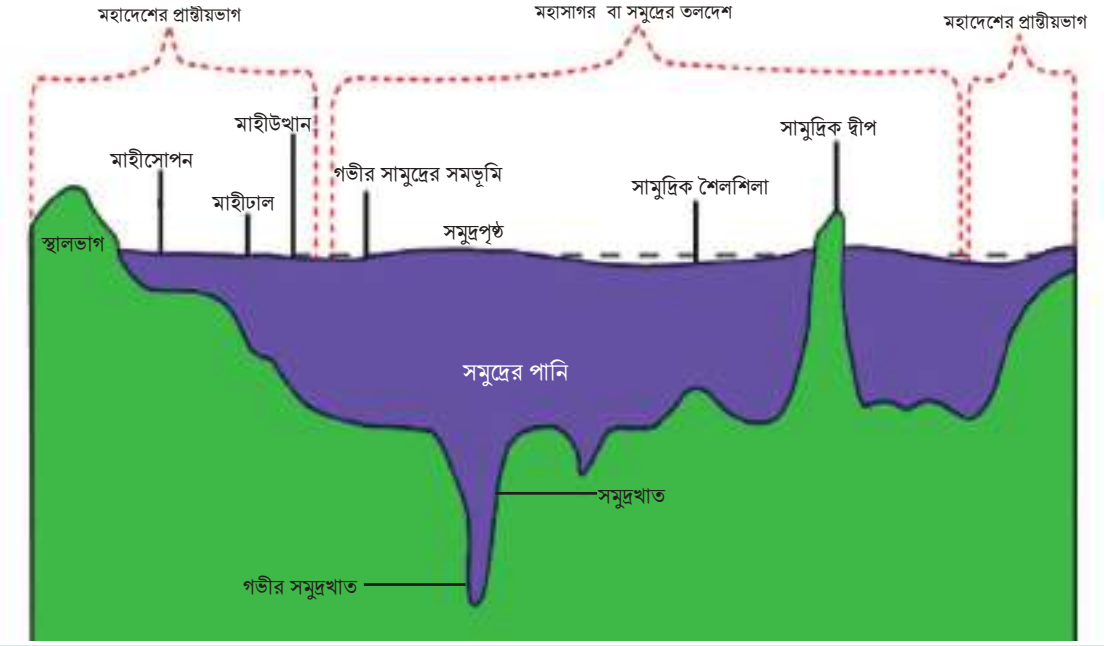

সমুদ্র এবং সংলগ্ন স্থলভাগ, দ্বীপের গঠনগত কাঠামো

স্থলভাগে অবস্থিত লবণাক্ত পানির হ্রদ সমূহে সামুদ্রিক বায়োমের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন: কাস্পিয়ান হ্রদ, জর্ডান ও ইজরায়েলের মধ্যবর্তী মৃতসাগর, ইরানের উরমিয়া হ্রদ ইত্যাদি। সামুদ্রিক বায়োমকে উল্লম্ব ভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা: পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া উপরের স্তর (Euphotic zone) যার গভীরতা প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে, এর পরের অপেক্ষাকৃত কম সূর্যালোক পাওয়া স্তর (Dysphotic Zone) এবং সবার নিচে সূর্যালোক পৌঁছায়না এমন স্তর (Aphotic zone)। সূর্যালোক প্রাপ্তির তারতম্য অনুযায়ী জীবের ধরন ও বিস্তরণ নির্ধারিত হয়। তবে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া উপরের ইউফোটিক স্তরে সমুদ্র বায়োমের প্রায়

৯০ শতাংশ জীবের বসবাস। সামুদ্রিক বায়োমকে তাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: মহাসাগরীয় বায়োম, প্রবাল প্রাচীরের বায়োম এবং মোহনার বায়োম। এসব বায়োমের পরিবেশ, বিদ্যমান উদ্ভিদ, প্রাণী বা অণুজীবের মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে। সামুদ্রিক বায়োমকে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা চিত্র থেকে সাগরের গঠন দেখে নেব।

সমুদ্র বায়োমের লবণ-সহিষ্ণু উদ্ভিদকে হ্যালোফাইট (Halophytes) বলা হয়। সমুদ্রের লবণ-সহিষ্ণু উদ্ভিদ গুলো বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী। এখানে ঘাস, ঝোপঝাড়সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফুল হয়ে থাকে। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমুদ্র বায়োমের উদ্ভিদগুলোকে প্রধানত সি-গ্রাস, কেল্প, সারগাসাম, ফাইটোপ্লাংটন এবং লাল শৈবাল এই পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। মজার বিষয় হচ্ছে, সামুদ্রিক উদ্ভিদ জগৎ অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও এখানে জন্মানো ৯৯ শতাংশ উদ্ভিদের জন্য লবণাক্ত সমুদ্র প্রাণঘাতী হিসেবে কাজ করে। আর মাত্র ১ শতাংশ উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকে।

সমুদ্র বায়োমের প্রাণীরা এতবেশি বৈচিত্র্যময় যে ছয়টি প্রধান প্রাণী শ্রেণিরই এখানে উপস্থিতি দেখা যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত উভচর প্রাণীরা, যাদের একটি অংশ সরাসরি সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে বাস না করে বরং অপেক্ষাকৃত কম লোনা পানিতে বসবাস করে। অমেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে স্পঞ্জ, শামুক, ঝিনুক, নানা ধরনের কীটপতঙ্গ, জেলিফিশ। সরীসৃপ প্রজাতির মধ্যে আছে সমুদ্র কচ্ছপ, সমুদ্র সাপ, লোনা পানির কুমির। এছাড়াও রয়েছে প্রায় ২০,০০০ এর অধিক প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের মাছ। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আছে নীল তিমি, সীল, সামুদ্রিক ভোঁদড়, মেরু ভাল্লুক, ডলফিন, সী লায়ন ইত্যাদি। ডাম্বো অক্টোপাস, ভ্যাম্পায়ার স্কুইডস, অ্যাংলারফিশ, জম্বি ওয়ার্মস ইত্যাদি সামুদ্রিক বায়োমের কিছু ভয়ানক প্রাণী। প্রায় ৩৫০ প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের পাখি সমুদ্র বায়োমের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যদিও সেগুলো খুব বেশি সময় সমুদ্রে কাটায়না। সমুদ্রের বৈরি পরিবেশে অভিযোজনের জন্য সমুদ্র বায়োমের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। যেমন অনেক উদ্ভিদের বিশেষ ধরনের শক্ত মূল রয়েছে যার মাধ্যমে এগুলো পাথর বা শক্ত কিছুর সঙ্গে লেগে থাকতে পারে এবং তীব্র স্রোতেও স্থানচ্যুত হয়না। প্রাণীরাও আলো, তাপ, খাদ্য এবং পানির চাপের ব্যাপক তারতম্যের মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। তাই সামুদ্রিক বায়োম সকল দিক দিয়েই বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়ায় এখানকার জীবগুলো পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ।

সামুদ্রিক বায়োম পৃথিবীতে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রাখা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং মানবজাতির জন্য খাদ্য এবং সম্পদের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে সমগ্র পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরের মাত্র ত্রয়োদশ শতাংশ তার স্বাভাবিক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, আর বাকী অংশ মানবসৃষ্ট নানা কারণ, যেমন: প্লাস্টিক দূষণ, অতিরিক্ত মাছ আহরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকী সৃষ্টি করেছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। এছাড়া রাসায়নিক দূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি সামুদ্রিক বায়োমের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মাছের প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকীতে রয়েছে যেমন:অ্যালবাকোর টুনা, আটলান্টিক কড, হ্যালিবাট, স্যালমন, সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি। যেহেতু এই সমুদ্র আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে জড়িত এবং পৃথিবীজুড়ে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ মাছ ধরে আয় এবং জীবিকার জন্য সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের এই সমুদ্র বায়োমের জীববৈচিত্র্য, রক্ষায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা জরুরি।

তবে উল্লিখিত বায়োমসগুলোর বাইরে স্বাদু পানির বায়োমের কথা বলা যেতে পারে। স্বাদু পানির বায়োম পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত, যার ফলে এই বায়োমে স্থান ভেদে জলবায়ুর ভিন্নতা রয়েছে। পুকুর, খাল-বিল, ডোবা, নদ-নদী গুলো মূলত স্বাদু পানির বায়োমের অংশ। স্বাদু পানির বায়োমেও নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্বাদু পানির বায়োম মানুষ ও প্রাণীদের জন্য প্রয়োজনীয় মিঠা পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এছাড়া এ বায়োমে প্রচুর পরিমাণে মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের জন্য প্রাণীজ আমিষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে কাজ করে।

উল্লিখিত বায়োমগুলো পৃথিবীতে জীবনের বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্যের প্রমাণ। এটি আমাদের বুঝতে হবে যে, পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য নয় আর মানুষ এককভাবে কখনো টিকে থাকতেও পারবে না। কারণ, মানুষ তার বেঁচে থাকার সমস্ত উপাদান তার আশপাশের জীব ও জড় পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে। অন্যান্য জীব ও মানুষ পরস্পরের সমৃদ্ধি এবং সুন্দর ও পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচার সহযোগী। পৃথিবীতে বিদ্যমান বায়োমগুলো মূলত মানুষ, অন্যান্য জীব ও প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ফুটিয়ে তোলে। প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট যেকোনো কারণেই হোক না কেন, যদি বায়োমসগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে তা মানুষের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। আবার মানুষ যদি তার বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনে, যেমন: খাদ্যাভ্যাস, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো সৃষ্টি, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদিতে, তবে প্রকৃতিতে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে। আর তাই এই অমূল্য বায়োম ও বিদ্যমান বাস্তুসংস্থানগুলোকে অনুধাবন করা ও সেই অনুযায়ী সেগুলোকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। ব্যক্তি পর্যায়ে একক প্রচেষ্টার চাইতে সবার সমন্বিতভাবে অংশগ্রহণে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীকে আজ এবং আগামীর জন্য সব জীবের বাস উপযোগী করে রাখতে পারি।

সমুদ্র সম্পদ এবং বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা:

সামুদ্রিকসম্পদ বলতে পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর এবং এর উপকূলীয় এলাকাগুলো জৈব-অজৈব সম্পদের বিশাল ভান্ডারকে বোঝায়। এই সম্পদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমরা সমুদ্র বায়োম বিষয়ে পড়ার সময় পেয়েছি। এসব সম্পদ যে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকীয়ে রাখতে এবং তার নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে বড়ো ভূমিকা পালন করে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমুদ্র এবং তা থেকে সংগৃহীত সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। এই অংশে আমরা মূলত সামুদ্রিক সম্পদের গুরুত্ব, এর প্রকারভেদ, বাংলাদেশে সামুদ্রিক সম্পদের ধরন ও সম্ভাবনা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনায় বাধাসমূহ বুঝতে চেষ্টা করব।

আমরা জানি, পৃথিবীর উপরিভাগের ৭০ ভাগ মহাসাগর যা এক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক সম্পদের আবাসস্থল। এসব সম্পদকে মূলত জীবন্ত (জৈব) এবং নির্জীব (অজৈব) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

জীবন্ত সামুদ্রিক সম্পদ:

(ক) মৎস সম্পদ: সমুদ্র মাছসহ অন্যান্য সামুদ্রিক খাবারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিশ্বজুড়ে সমুদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্য ও জীবিকার জোগান দেয়। এই প্রাকৃতিক সম্পদ মৎস্য খাত বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয় এই উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত মাছের ওপর নির্ভর করে আমাদের দেশে সমৃদ্ধ মৎস্য শিল্প গড়ে উঠেছে সামুদ্রিক মৎস্য খাত বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস যা খাদ্যনিরাপত্তা ও রপ্তানি আয়েও অবদান রাখছে।

(খ) অ্যাকুয়াকালচার: অ্যাকুয়াকালচার, যা মৎস্য চাষ নামেও পরিচিত। নিয়ন্ত্রিত জলজ পরিবেশে মাছ, শেলফিস ও জলজ উদ্ভিদ চাষের সঙ্গে এটি সম্পর্কীত। এটি সিফুডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং প্রোটিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মাছ চাষ। পুকুর, ঘের এবং উপকূলীয় এলাকার কৃষিজমিতে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের পানি ধরে রেখে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া এবং বাগদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে দেশে অ্যাকুয়াকালচারে উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে, রপ্তানি আয় বাড়াতে এবং প্রাকৃতিক মাছের মজুদের ওপর চাপ কমাতে অ্যাকুয়াকালচার অবদান রাখছে।

(গ) সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য: মহাসাগরসমূহ সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তৃত সমাহারে সমৃদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর এক বিশাল সম্ভার। এই প্রজাতিসমূহ বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা, পুষ্টিপ্রবাহ এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম যেমন পর্যটন ও ডুবুরিদের কাজে (Diving) অবদান রাখে। এছাড়া বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও শৈবালেরও পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন।

নির্জীব সামুদ্রিক সম্পদ:

(ক) খনিজ এবং জ্বালানি: সমুদ্রের তলদেশে মূল্যবান খনিজ পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ নডিউলস, কোবাল্টসমৃদ্ধ ক্রাস্ট এবং তলদেশের খনিজ ও শিলার আকরিক আধার (Hydrothermal Vent deposits)। সমুদ্র উপকূল থেকে দূরবর্তী গভীর সমুদ্রে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং নবায়নযোগ্য শক্তির (যেমন: বায়ু ও জোয়ারের শক্তি) গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নবায়নযোগ্য শক্তি, বিশেষ করে সমুদ্রতীরবর্তী বায়ু, ঢেউ এবং জলোচ্ছ্বাসের শক্তি সুনীল অর্থনীতির আরেকটি সম্ভাবনাময় খাত। দেশের জ্বালানি খাতের উৎসকে বহুমুখী করতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে বায়ু বা সমুদ্রের ঢেউ এর শক্তি ব্যবহার করার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা হচ্ছে। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্রতীর থেকে লম্বালম্বি ভাবে ২০০ নটিক্যাল (১ নটিক্যাল মাইল= ১,৮৫২ মিটার) দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত বাংলাদেশের একচেটিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone)। এতে বাংলাদেশের একচ্ছত্র মালিকানা রয়েছে। এখানে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ইত্যাদির অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তবে এ ধরনের জ্বালানি অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

সমুদ্র সম্পদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার ধরণ

(খ) বালি ও নুড়ি: উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বালি ও নুড়ি জমা হয়। এগুলো নির্মাণশিল্প, যেমন: ভবন নির্মান সামগ্রী হিসাবে ও সমুদ্রতট সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত দীর্ঘ সমুদ্রসৈকতে পাওয়া যায় কালো রঙের খনিজ বালু, যা মূলত ভারী খনিজ পদার্থ। এসব কালো রঙের বালুতে জিরকন, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, গার্নেট, রিউটাইল, লিওকনিক্স, কায়ানাইট, মোনাজাইট এর মতো মূল্যবান ভারী খনিজ রয়েছে। এসব খনিজ পদার্থ শিল্পে ব্যবহার এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য সম্ভাবনাময়।

(গ) পর্যটন: বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখা প্রায় ৭১০ কীলোমিটার দীর্ঘ। তাই এই দীর্ঘ তটরেখা ধরে পর্যটন ও বিনোদন নতুন অর্থনৈতিক খাত হিসাবে বিবেচিত। পর্যটন সম্ভাবনাময় উপকূলীয় এলাকার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক বালুকাময় সমুদ্র সৈকত ও এর সংলগ্ন এলাকা এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যটকদের আকর্ষণ করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন যা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। এটি সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের মতো বিপদ থেকে আমাদের রক্ষার কাজ করে। আবার পর্যটকদের জন্যও এটি আকর্ষণীয় স্থান। সুন্দরবনের পূর্বদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সামুদ্রিক পরিবহন ও সরবরাহ, সামুদ্রিক পরিষেবা, জাহাজ নির্মাণ এবং উপকূলীয় শিল্প কার্যক্রমও বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। বন্দর এবং টার্মিনালগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করে, একই সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ শিল্প কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি আয়ে অবদান রাখে।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা সেগুলোর দীর্ঘমেয়াদী যোগান নিশ্চিত করতে পারে। তবে এই টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো হলো:

১. অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং নিঃশেষকরণ: অতিরিক্ত মাছ ধরা, অবৈধভাবে মাছ ধরা এবং মাছ ধরার ধ্বংসাত্মক কৌশল ব্যবহারের ফলে যেমন মাছের মজুদ হ্রাস পাচ্ছে, তেমনি ভাবে সেগুলো প্রজননও ব্যাহত হচ্ছে। এতে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্য হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ জরুরি।

২. আবাসস্থল ধ্বংস এবং দূষণ: সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছ ধরা, উপকূল এলাকায় নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালানো এবং রাসায়নিক ও প্লাস্টিক দূষণের মতো কর্মকান্ডে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ-প্রাণীদের আবাসস্থল ধ্বংস, বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন এবং তাঁদের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিপন্ন আবাসস্থল রক্ষা, সমুদ্রের স্থানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সব ধরনের দূষণ হ্রাস করা অত্যন্ত জরুরি।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন: মহাসাগরসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এসবের মধ্যে আছে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অম্লতার বৃদ্ধি এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি । এই পরিবর্তনগুলো সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রজাতির বণ্টন ও সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটছে। এতে পরিবেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলো ব্যাহত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবগুলো কমিয়ে আনার জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৪. সমুদ্র ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন কারণ, মহাসাগরগুলো নানা দেশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সবার সম্মিলিত সম্পদ। কোনো একক দেশের মাধ্যমে এর ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। তাছাড়া এতে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা দিতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার মতো কার্যকর শাসনকাঠামো অতিরিক্ত বা অবৈধ মাছ ধরা, দূষণ ও চোরাচালান রোধ এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করতে পারে।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা নির্ধারণ, টেকসই মৎস্য আহরণ ও চাষ, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক দূষণ কমানোর উদ্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো চিহ্নিতকরণ ও প্রশমিত করা। অর্থনৈতিক উন্নতি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ ও সুনীল অর্থনীতির যে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন শুধু স্থলভাগের সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার সহনশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিতে, ঝুঁকীপূর্ণ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং টেকসই অ্যাকুয়াকালচারের উন্নয়নে নীতি ও প্রবিধান বাস্তবায়ন করছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বর্জ্য নিঃসরণে কঠোর বিধি-বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে দূষণ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। উপকূলীয় ক্ষয় ও ভাঙন মোকাবিলা, টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ এবং সুনীল অর্থনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবিকা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা

বন হলো পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষ এবং পরিবেশের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগান দেয়। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখা, জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা এবং বিভিন্ন পণ্য ও সেবার জন্য বনভূমি অপরিহার্য। এই অংশে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে বনের তাৎপর্য এবং বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কীত চ্যালেঞ্জগুলো জানব। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর ২০২২ সালের তথ্য মতে পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের প্রায় শতকরা ৩১ ভাগ জুড়ে বনভূমি রয়েছে এবং উদ্ভিদ, পাণী জগৎ ও বাস্তুতন্ত্র ভেদে এসব বনভূমি খুবই বৈচিত্র্যময়। পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং এই গ্রহের কার্যকলাপ সচল রাখতে বনভূমি নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে বনের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ: বন হলো প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির বিস্তীর্ণ আবাস। এসব প্রজাতির মধ্যে অনেকে আজ বিপন্ন। অনেক প্রজাতি আছে যাঁরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ বা প্রাণী হিসাবে পরিচিত (endemic)। বনভূমিসমূহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখে। তারা অসংখ্য জীবের জন্য আবাসস্থল, খাবারের উৎস এবং আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে। বন না থাকলে পৃথিবীতে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য টিকীয়ে রাখা সম্ভব হতো না।

২. কার্বন শোষণ এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ: বায়ুমণ্ডলের কার্বন চক্রে বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনের বৃক্ষরাজি সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং গাছ ও মাটিতে কার্বন সংরক্ষণ করে। তারা কার্বন সিঙ্ক হিসাবে কাজ করে, বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব হ্রাস করে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত করতে বনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

৩. কাঠ এবং অ-কাঠ জাতীয় পণ্যের যোগান: বন হলো কাঠের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস, যা নির্মাণসামগ্রী, আসবাবপত্র এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয়। উপরন্তু, বন বিস্তৃত পরিসরে অকাষ্ঠ-জাতীয় পণ্য যেমন ফল, বাদাম, ঔষধি গাছ, ফাইবার, রজন এবং প্রাকৃতিক রঙের সরবরাহ করে থাকে। এসব পণ্যের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ঔষধি মূল্য অপরিসীম।

৪. জলাভূমি সুরক্ষা এবং পানির সরবরাহ ও গুণ নিয়ন্ত্রণ: বনভূমি পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে, পানির গুণমান বজায় রাখে এবং ভূগর্ভস্থ পানির উৎস পূরণ করে পানি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন পানির প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া বন পলল এবং বিভিন্ন দূষককে ধরে রাখে এবং মানুষ ও পরিবেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

> কার্বন সিঙ্ক হলো এমন কিছু যা বায়ুমণ্ডলে যতটুকু কার্বনডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়, তার থেকে বেশি পরিমাণে শোষণ করে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে। বনভূমি, সমুদ্র এবং মাটি পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে।

৫. বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক মূল্য: বনভূমি মানুষের জন্য নির্মল বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন: হাইকীং, ক্যাম্পিং, বন্য প্রাণী পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতি পর্যটন ইত্যাদি। বন অনেক সম্প্রদায়ের জন্য সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে, ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

এসবের বাইরেও বনভূমি আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুরক্ষা দিয়ে থাকে। ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানা ভয়াবহ ঝড় সিডরের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সুন্দরবন সে সময় ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সম্পদ বহুলাংশে রক্ষা করেছিল। সুন্দরবন না থাকলে ক্ষয়-ক্ষতি আরও ব্যাপক হতে পারত। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন আমাদের এভাবেই রক্ষা করে আসছে।

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের বনজ সম্পদও দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ এবং মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছোটো দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে বৈচিত্র্যময় বনভূমির বাস্তুতন্ত্র রয়েছে যা মানুষকে বিভিন্ন সুবিধা ও সেবা প্রদান করে থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। চা ও রাবার বাগানসহ বাংলাদেশের মোট বনভুমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ১৭.৪ শতাংশ। বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় বনভূমিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরসবুজ এবং অর্ধ-চিরসবুজ বন: এই বনভূমিগুলো দেশের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে পাওয়া যায়। এগুলো ঘন গাছপালায় আচ্ছাদিত, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ, গুল্ম এবং লতা। এ বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষের মধ্যে আছে সেগুন, গর্জন, মেহগনি, গামারি, জারুল, চাঁপালিশ, শিমুল, কড়ই ইত্যাদি।

এই বনে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ দেখা যায়, যেমন:মূলী, মিতিংগা, ভুলু, ওরাহ। এক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি থেকে আহরিত বাঁশের ওপর ভিত্তি করে চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বনে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বৃক্ষরাজির পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে রাবার গাছের চাষ করা হচ্ছে। তবে এ রাবার চাষের পরিবেশগত ফলাফল ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় এখনো ততটা সফল বলা চলে না। এই বনগুলো হাতি, হরিণ, শূকর, শজারু এবং বিভিন্ন প্রজাতির বানরসহ অসংখ্য প্রজাতির বন্য প্রাণীর আবাসস্থল। তবে এ বনভূমিতে মানুষের বিচরণ বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বনায়ন দিন দিন প্রাণীদের বাসস্থান এবং বংশবৃদ্ধি হুমকীর মুখে ফেলে দিয়েছে।

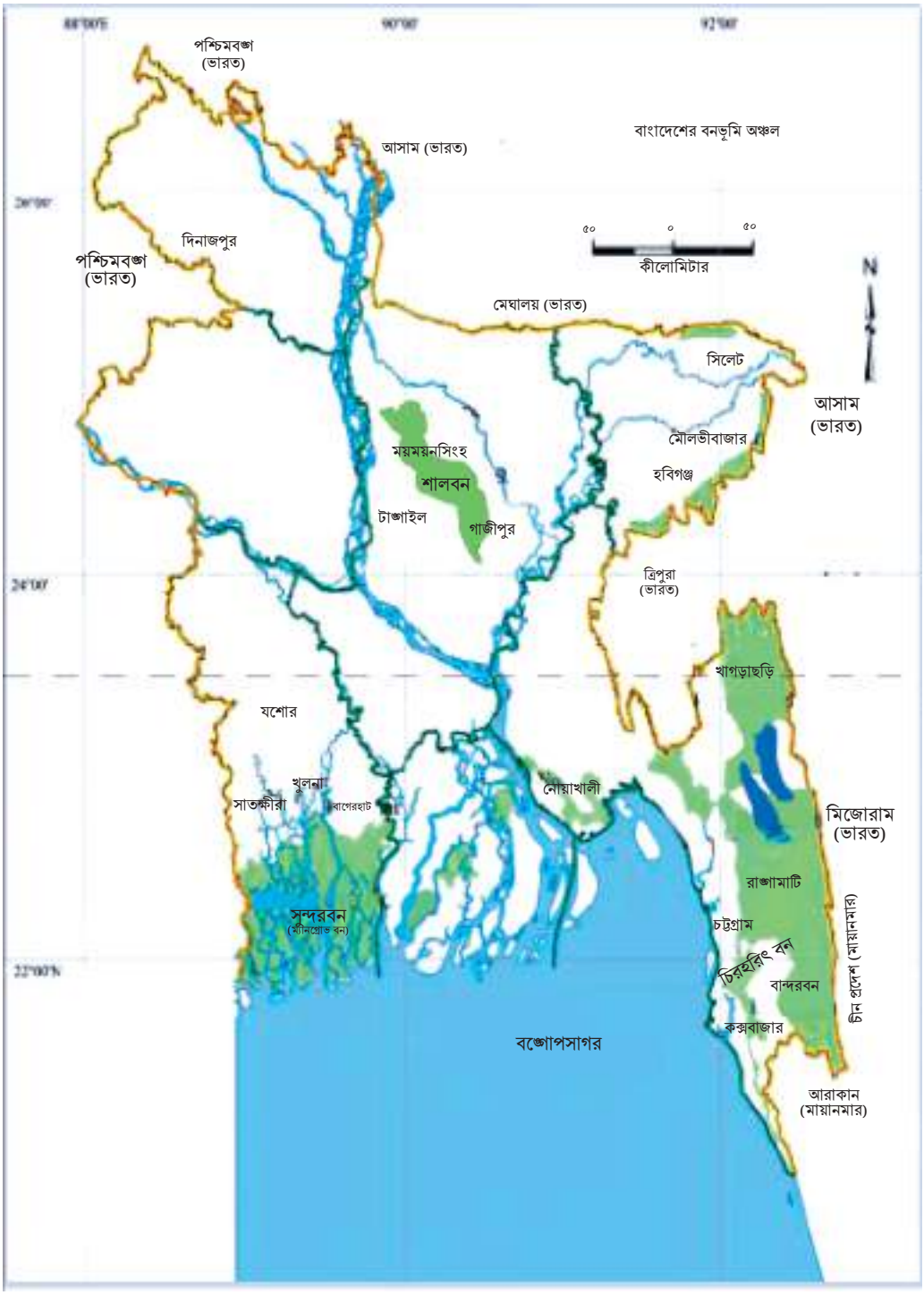

বাংলাদেশের বনাঞ্চল সমূহ (শালবন, চিরহরিৎ বন, ম্যানগ্রোভ বন)

২. ম্যানগ্রোভ বন: সুন্দরবন, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ (৫২২ তম বিশ্ব ঐতিহ্য)। এই লোনা পানির বন বাংলাদেশের বনজ সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এবং এর অনন্য জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার দক্ষিণাংশ জুড়ে এই বন বিস্তৃত। এই বন সমুদ্রের তীরে হওয়ায় জোয়ারের পানিতে প্রতিদিন প্লাবিত হয় এবং মাটি সিক্ত ও কর্দমাক্ত থাকে। এ বনের সুন্দরী গাছে বিশেষ ধরনের শ্বাসমূল রয়েছে যা মাটির উপর ওঠে এসে উদ্ভিদকে অক্সিজেন নিতে সাহায্য করে। এ ধরনের শ্বাসমূলকে ইংরেজিতে Pneumatophore বলে। সুন্দরী, গেওয়া, গরান, পশুর, গোলপাতা, কেওড়া, ধুন্দুল, বাইন ইত্যাদি এ বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। এ বন থেকে আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ, যানবাহন তৈরির উপযোগী কাঠ, ঘরের ছাওনি ও বেড়া তৈরির জন্য গোলপাতা সহ পেন্সিল, দিয়াশলাই, নিউজপ্রিন্ট তৈরির কাঁচামাল পাওয়া যায়। লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত এ বনে মাছ, মধু, মোম, শামুক-ঝিনুক ইত্যাদি পাওয়া যায়। বর্তমানে সুন্দরবনে প্রায় ১২০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া কাঁকড়া, চিংড়ি, কাছিম, কুমির, ডলফিন, হাঙর, ভোঁদড় রয়েছে এখানে। প্রাণীদের মধ্যে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, শূকর, বানর, বনবিড়াল, বাঘরোল, গুইসাপ, অজগর দেখতে পাওয়া যায়। পাখপাখালির মধ্যে বক, পানকৌড়ি, ধনেশ, লাল কাক, শঙ্খচিল, মাছরাঙা, ঘুঘু ইত্যাদির বিচরণ দেখা যায়।

৩. শাল বন: বাংলাদেশের মধ্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে টাঙ্গাগাইলের মধুপুর, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা এবং সিলেট অঞ্চলে শালবন দেখা যায়। এই বনগুলোতে শালগাছের উপস্থিতি সর্বাধিক বলেই এরকম নামকরণ। এটি মূলত ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বন। দিনাজপুর, রংপুর এবং নওগাঁ জেলাতেও এ বনের সামান্য অংশ দেখতে পাওয়া যায়। এ বনে কাঠ উৎপাদনকারী গাছের মধ্যে আছে গজারি, কড়ই, মনকাটা, সেগুন, হিজল, হরীতকী ইত্যাদি। এছাড়া আমলকী, বেল, জাম, তেঁতুল, কাঁঠাল, বৈরাগীলতা, বহেরা, ধূতরা ইত্যাদি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এ বন একসময় চিতাবাঘ, ভাল্লুক, হরিণের মতো প্রাণীর জন্য বিখ্যাত থাকলেও এখন এগুলো দেখা যায়না। তবে হনুমান, বানর, শিয়াল, গুঁইসাপ ইত্যাদি প্রাণী এবং বেশকিছু পাখ-পাখালি এ বনে এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা জানি, মানুষ ও প্রকৃতির ভারসাম্যপূর্ণ বসবাস এবং তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে কোনো দেশের মোট আয়তনের পঁচিশে ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বনভূমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। এর পেছনে যেসব কারণ প্রধান তা হলো—

১. বন উজাড় এবং অবৈধ গাছ কাটা: জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির সম্প্রসারণ এবং অবৈধ গাছ কাটার মাধ্যমে বন উজাড় দেশের বনাঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকী। এর ফলে বনভূমি বিনাশের পাশাপাশি বন্য প্রাণীর বাসস্থানের ক্ষতি, মাটির ক্ষয় এবং মূল্যবান বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।

২. দখল ও ভূমির রূপান্তর: কৃষি, বসতি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রায়ই বনাঞ্চল দখল করা হয়। বনভূমির এই রূপান্তর বনের বাস্তুতন্ত্রের বিস্তার এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য সমন্বয়ে ব্যাঘাত ঘটায়।

৩. বন্য প্রাণী শিকার এবং এর অবৈধ ব্যবসা: অনিয়ন্ত্রিত শিকার এবং বন্য প্রাণীর অবৈধ ব্যবসা বাঘ, হাতি ও বানরসহ বিপন্ন প্রজাতির জন্য হুমকী হয়ে উঠেছে এই কর্মকাণ্ডগুলো বাস্তুতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে।

উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে:

১. সংরক্ষিত এলাকা নির্ধারণ: সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল সুরক্ষিত করার জন্য জাতীয় উদ্যান, বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য এবং প্রকৃতি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন সংরক্ষিত বনায়ন প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. কমিউনিটি-ভিত্তিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা: বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় স্থানীয় সম্প্রদায় এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং বন পুনরুদ্ধারে এই সহযোগিতামূলক উদ্যোগ স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৩. পুনঃবনায়ন এবং বনায়ন: ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার এবং বনায়ন কর্মসূচি প্রসারের প্রচেষ্টা চলছে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃক্ষ রোপণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা।

৪. আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ: সরকার অবৈধ গাছ কাটা, বন্য প্রাণী শিকার এবং বন্য প্রাণীর অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কঠোরভাবে বিধিবিধান এবং জরিমানা বাস্তবায়ন, নজরদারি বাড়ানো এবং বন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা:

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বলতে সঠিক সময়ে নির্বাচিত গাছ কাটা, নিয়ন্ত্রিতভাবে ফসল সংগ্রহ এবং বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনজ সম্পদের যৌক্তিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহারকে বোঝায়। এর লক্ষ্য হল জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নিশ্চিত করা। মোট কথা হলো, বনজ সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বনের উৎপাদনশীলতা ও স্থায়িত্ব ভবিষ্যতে হ্রাস না পেয়ে বরং ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে বনজ সম্পদ আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে পারে। টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত মান বজায় রাখা এবং বৃদ্ধি করা হয়। টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের জন্য জাতীয় আইন, নীতি, কৌশল, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২০পঁচিশে) অধীনে দেশের বন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বনের ওপর চাপ কমাতে বননির্ভর মানুষের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, দখলকৃত বন পুনরুদ্ধার, বন্য প্রাণী ও বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে বন পাহারার ব্যবস্থা, জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি সরবরাহ, উন্নত ভূমি ব্যবহার নীতি বাস্তবায়ন, বনের অবক্ষয় মোকাবিলায় অংশীজনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো এবং সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধি টেকসই বন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্থানীয় এবং আদিবাসী সম্প্রদায় যাঁরা জীবিকা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য বনভূমির ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্যোগ এবং টেকসই উন্নয়ন:

দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিক কারণে এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপে সৃষ্ট চরম বা বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিকে বোঝায়। এরকম ঘটনায় মানুষের জীবন, অবকাঠামো এবং পরিবেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়। দুর্যোগ প্রায়ই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত, মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রাকৃতিক শক্তির কারণে ঘটে, যেমন: বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি ইত্যাদি। আবার মানুষের ভুল, অসর্তকতা বা অপরিকল্পিত কাজের ফলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, যেমন:জলাবদ্ধতা, সামাজিক নৈরাজ্য, অপরিকল্পিত নির্মাণ বা উন্নয়ন, যুদ্ধ ইত্যাদি। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের ভুল বা অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের কারণে ত্বরান্বিতও হতে পারে, যেমন:অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাটলে বা নদীতে বাঁধ দিলে বা বালি তুললে ভূমিধস, নদীভাঙন, বন্যা হতে পারে।

যেকোনো দুর্যোগের ফলে গুরুতর আর্থসামাজিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় হতে পারে, যা মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ প্রয়োজন হয়। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সৃষ্ট পরিস্থিতির ভয়াবহতা আক্রান্ত সমাজের সামর্থ্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সামর্থ্য হচ্ছে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দুর্যোগকালে বা দুর্যোগের পরে ইতিবাচক সাড়া দেবার সার্বিক সক্ষমতা। কোনো জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের সঙ্গে সেখানকার টেকসই উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কীত। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিরূপ এবং জলবায়ুর কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকীপূর্ণ একটি দেশ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী প্রণালীর ব-দ্বীপ এবং বঙ্গোপসাগরের সীমান্ত ঘেঁষে থাকায় বাংলাদেশ সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদীভাঙন,বজ্রপাত, ভূমিধস, খরা ইত্যাদি। দুর্যোগের মতো ঘটনা দেশের মানুষ, অবকাঠামো এবং অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমরা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জানি। তবে নদীমাতৃক এই দেশের একটি নিরন্তর সমস্যা হলো নদীভাঙন।

নদীভাঙন: নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে খরস্রোতা নদীগুলোর তীরে এটি বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে নদীর তীব্র স্রোতোধারা তীরকে দ্রুত ক্ষয় করে, যার ফলে কৃষি জমি, বসতভিটা এবং অবকাঠামো নদীতে বিলীন হয়। নদীভাঙন ঐসব এলাকার জনগোষ্ঠীকে বাস্তুহারা করে এবং এর ফলে তাঁদের স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকা হুমকীর মুখে পড়ে। নদী ভাঙনের শিকার জনগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। আর বারবার এমন ঘটলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসিত করা রাষ্ট্রের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় প্রায় ১২০০ কী.মি. এলাকা জুড়ে ভাঙন অব্যাহত আছে। এছাড়া বর্ষাকালে যমুনা নদীসহ দেশের অন্যান্য নদীর পানিপ্রবাহের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছরই বহু মানুষ তাঁদের জমি-জমা, ঘরবাড়ি নদী ভাঙনের মাধ্যমে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। ফলে ঐসব এলাকার মানুষ দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে বাধার সম্মুখীন হয়।

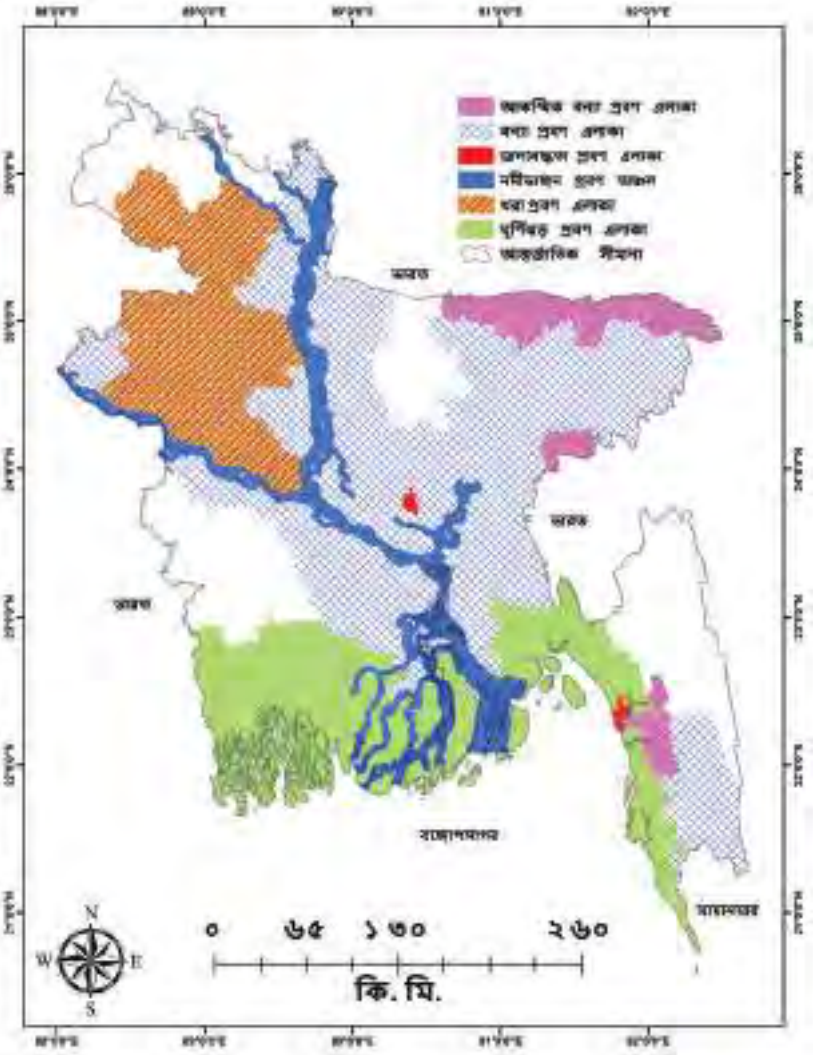

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা

বজ্রপাত: পৃথিবীর অনেক দেশেই বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে, তবে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২১ সালে বাংলাদেশে বজ্রপাতে ৩৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আবার প্রতিবছর দেশে বজ্রপাত ১৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। বনভূমি ও উঁচু বৃক্ষ উজাড়, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর অন্যান্য নিয়ামকের পরিবর্তন বজ্রপাত বাড়ার মূল কারণ। আর ঘনবসতি, বজ্রপাতের মৌসুমে উন্মুক্ত স্থানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসরণ না করা, অসচেতনতা ইত্যাদি বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে ঘোষণা করে এটির কারণে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে।

জলাবদ্ধতা: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের নগর বা শহরগুলো বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বাসিন্দারা এ সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। এর পেছনে দায়ী আমাদের অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন, ত্রুটিপূর্ণ বর্জ্যব্যবস্থাপনা, প্লাস্টিক দূষণ, খাল-নালা ও অন্যান্য জলাশয়ের ভরাট ও দখল ইত্যাদি। তাই এ সমস্যা যে আমাদেরই সৃষ্ট তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শহরের ড্রেন ও প্রাকৃতিক নালায় প্লাস্টিক বোতল, পলিথিন ও আবর্জনা ফেলার কারণে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে যায় এবং অনেক স্থানে নালা সংকুচিত করার ফলে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। যার ফলে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনে আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ। এছাড়া ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ সমস্যাকে প্রশমিত করা সম্ভব।

ভূমিধস: ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক এবং মানবসৃষ্ট নানা কারণে ভূমিধসের মতো দুর্যোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন এলাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূমিধসের প্রকোপ বেড়েছে। এসব এলাকার পাহাড়গুলোর মাটিতে বেলে কণার আধিক্য দেখা যায়। ফলে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় মাটির উপরেরঅংশ পানি ধারণ করে ভারী হয়ে উঠলে তা নিচের স্তরকে ছেড়ে দিয়ে প্রচন্ড বেগে নিচের দিকে নেমে আসে। আর পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসরত মানুষ তখন এর নিচে চাপা পড়ে জান-মাল হারায়। সাম্প্রতিক সময়ে এ দুর্যোগে উল্লিখিত পাহাড়ি এলাকাগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। এ দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধির পেছনে মানবসৃষ্ট কারণও দায়ী, যেমন: নির্বিচার পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন, রাস্তাঘাট ও কৃষিজমি সৃষ্টি, গাছ কেটে উজাড় করার ফলে মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়া ও ওপরের স্তর আলগা হয়ে যাওয়া। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন হচ্ছে, যেমন: অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ বৃষ্টি, যার ফলে ভূমিধসের মতো দুর্যোগ বেড়েছে বলে মনে করা হয়।

খরা: খরা হলো দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক হ্রাস। খরার ফলে পানির অভাব, ফসলের ক্ষতি এবং পানির উৎসের ক্ষতি সাধিতা হয়। খরা কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা এবং জীবিকার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। মোটা দাগে খরাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা আবহাওয়ার শুষ্কতার ভিত্তিতে খরা এবং কৃষিকাজের জন্য মাটিতে আর্দ্রতার অভাবজনিত খরা। আমাদের দেশের উত্তরাংশ, বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল খরাপ্রবণ এলাকা হিসাবে পরিচিত। এ অঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া জেলা গুলোকে খরাপ্রবণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতে পরিবর্তন এবং উজান থেকে আসা নদী গুলোর উৎসে বাঁধ দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এ অঞ্চলে খরার প্রবণতা বাড়ছে বলে মনে করা হয়।

ভূমিকম্প: পৃথিবীর ভূত্বক থেকে হঠাৎ শক্তি নিঃসরণের ফলে ভূমি কাঁপতে থাকে, যার ফলে ভূমিকম্প হয়। এর ফলে ভবন ধস, ভূমিধস এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। সাগরের তলদেশে ভূমিকম্প হলে তাতে সুনামি হতে পারে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিকভাবে এমন এলাকায় অবস্থিত যেখানে দুটো প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে যার নাম; ডাউকী ফল্ট। সিলেট থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এ ফল্টের কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকীতে রয়েছে। ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর পেছনে কারণ হলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি ভবন, ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন তৈরিতে উদাসীনতা, ভূমিকম্প নিয়ে সচেতনতা ও প্রস্তুতির অভাব। তাই ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকা জরুরি।

উপরে উল্লিখিত দুর্যোগের বাইরেও লবণাক্ততার বিস্তৃতি, গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী বা টর্নেডো, নদী ও পানি দূষণ, বড়ো শহরগুলোতে অতিরিক্ত মাত্রায় বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ, বড়ো বড়ো নগরগুলোরে তাপীয়-দ্বীপের সৃষ্টি ও দাবদাহ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, আর্সেনিক দূষণের মতো সমস্যাগুলো দিনে দিনে মানুষের কাছে ভয়াবহ বার্তা নিয়ে আসছে।

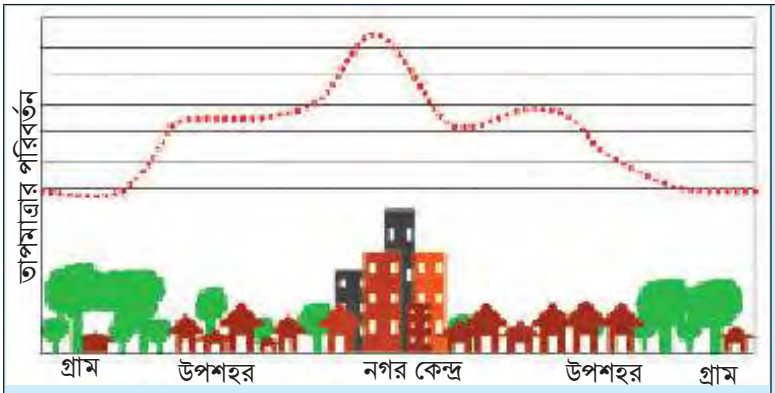

চিত্রে ডটেড লাইনের মাধ্যমে গ্রাম, উপশহর বা নগর কেন্দ্রের তাপীয় অবস্থার একটি তুলনামূলক ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নগর কেন্দ্রের দিকে লাইনটি উঁচু হয়ে দ্বীপের আকৃতি লাভ করেছে, যাকে বলা হচ্ছে নগর-তাপীয়-দ্বীপ।

উন্নত দেশসগুলো বড়ো শহরগুলো বা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ গুলোর ঘনবসতিপূর্ণ অপরিকল্পিত শহরগুলোর মানুষ তাঁদের আশপাশের গ্রামাঞ্চলগুলো থেকে বেশি গরম অনুভব করে। পার্শ্ববতী গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলো এরকম অধিক উত্তপ্ত থাকাকে নগর-তাপীয়-দ্বীপ (Urban Heat Island) বলা হয়। শহরের পাকা দালান ও রাস্তাঘাট, শিল্পকারখানা, যানবাহন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জনিত কারণ নগর-তাপীয়-দ্বীপ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি এবং তা ঘটলে দুর্গত মানুষদের প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বাংলাদেশ সরকার এবং কমিনিউনিটি পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়:

১. আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা: সরকার ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য দুর্যোগ আঘাত হানার বিষয়ে সময়মতে তথ্য প্রদানের জন্য আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই ব্যবস্থাগুলো বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে নিতে এবং প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করে।

২. দুর্যোগকালীন সাড়াদান এবং ত্রাণ: সরকার, বিভিন্ন সংস্থা এবং জনসাধারণের একযোগে সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু আছে। তারা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, জরুরি চিকীৎসা সেবা, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। দুর্যোগের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেন যথাযথ ও সমন্বিত ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্য সরকার দুর্যোগের সময়ের জন্য স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) প্রণয়ন করেছে।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রস্তুতি: সরকারের জাতীয় নীতি ও কৌশলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রস্তুতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে সক্ষমতা তৈরি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা যাতে জনগণ এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো যায়।

৪. জনসচেতনতা এবং শিক্ষা: সম্ভাব্য ঝুঁকী, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং উদ্ধারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা গেলে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং সাড়াদানের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব, এসব কাজের মধ্যে রয়েছে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, স্কুল প্রোগ্রাম এবং কমিউনিটি ড্রিল ইত্যাদি।

৫. টেকসই অবকাঠামো: প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ্য করতে পারে এমন টেকসই অবকাঠামো তৈরি করা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে বিল্ডিং কোড এবং নির্ধারিত মান অন্তর্ভুক্ত করা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং ভূমি-ব্যবহারের সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৬. পরিবেশ সংরক্ষণ: ম্যানগ্রোভ, জলাভূমি এবং বনের মতো প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও সংরক্ষণ করা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে। এই বাস্তুতন্ত্রগুলো প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার কাজ, ঝড়ের তীব্রতা হ্রাস, ক্ষয় রোধ এবং অন্যান্য বাস্তুতান্ত্রিক সেবা প্রদান করে। সিডর এবং আইলার মতো ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে সুন্দরবন যেভাবে আমাদের ক্ষতি কমিয়ে দিয়েছে, তা পরিবেশ এবং বনভূমির গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরে।

৭. **কমিউনিটি-ভিত্তিক পদ্ধতি:** কমিউনিটি-ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগের মধ্যে প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, দুর্গত মানুষকে উদ্ধার পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই উদ্যোগগুলো দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার মানুষকে প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম করে তোলে।

টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি হলো এমন একটি সাংগঠনিক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে বর্তমানের চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা টেকসই উন্নয়েনর মূল তিনটি অনুষঙ্গ। টেকসই উন্নয়নকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের শহর রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত আর্থ সামিটে। দুর্যোগ ঝুঁকী হ্রাস সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। আবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের নিশ্চিত করতে পারলেই মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলার এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকী কমানোর জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, জরুরি প্রয়োজন ও সেবার সুরক্ষা, আন্তঃযোগাযোগ ও সহযোগিতা এবং আর্থিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়। এ বিষয়গুলোর যোগান নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্যোগের জন্য আগামবার্তা, প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সাড়া দেওয়া এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।